Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন : কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামী জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিরাতুর শেফা ফিমু

রোলঃ 23090120357

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন : কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামী জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সিরাতুর শেফা ফিমু

রোলঃ 23090120357

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন : কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামী জবাব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সিরাতুর শেফা ফিমু, আইডিঃ 23090120357 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন : কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামী জবাব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিরাতুর শেফা

(স্বাক্ষর)

সিরাতুর শেফা ফিমু

আইডিঃ 23090120357

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ট্রান্সজেন্ডার কি? 6

লিঙ্গ সার্জারি বা রূপান্তর 6

এলজিবিটিকিউ এর ধারনা 8

হিজড়া বা ইন্টারসেক্স 9

হিজড়া বনাম ট্রান্সজেন্ডার 10

শরীয় দৃষ্টিতে হিজড়াদের অবস্থান 11

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়া 12

কওমে লূত (আঃ)-এর পরিণতি 15

ট্রান্সজেন্ডারবাদ 18

সমকামী পরিচয়ের অগ্রদূত 21

সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ 22

যৌন বিপ্লবের জনক 24

জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের জনক 24

ট্রান্সজেন্ডারের বাস্তব কিছু দৃষ্টান্ত 26

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারের কারণ ও প্রভাবক সমূহ 29

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন 35

ট্রান্সজেন্ডারের পৃষ্ঠপোষক ব্র্যাক ও এর সহযোগী 35

পশ্চিমাদের ভয়াল থাবা : LGBTQ এর বিস্তার 39

আইন প্রনয়ণ 42

ট্রান্সজেন্ডার আইনের অনিবার্য পরিণতি 43

ট্রান্সজেন্ডারবাদের শরয়ী দৃষ্টিকোণ.....45
ইসলামে তৃতীয় লিঙ্গ বলতে কিছু নেই.....56
ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহ কুফল.....57
মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ.....64
ট্রান্সজেন্ডার এর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি.....65
জাতির এই সংকটে আমাদের করণীয়.....66
উপসংহার.....68
রেফারেন্স:.....69

ভূমিকা

ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি মানবতা বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী ভয়ংকর নীরব ঘাতক যা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিক থেকে দিগন্তে। এর ভয়াল থাবা থেকে রেহাই পায়নি ৯০% মুসলিম খ্যাত বাংলাদেশও। শরীয়ত বিরোধী এমন ঘৃণ্য মতবাদ বাংলাদেশের জন্য কিংবা প্রতিটি মুসলিমের জন্য খুবই লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। ট্রান্সজেন্ডারবাদ মানবতা ও বাস্তবতা বর্জিত, প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সমাজ বিরুদ্ধ এবং শরীয়ত বিরোধী একটি মতবাদ। নারী ও পুরুষ অখন্ড মানব সত্তা এবং সমাজের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। শারীরিক শক্তি, সামর্থ্য, সক্ষমতা বিবেচনায় নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধিতে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি ধর্মচর্চা তথা ইসলামী শরীয়তের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য বিবেচ্য বিষয়। একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই তার লিঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন : খৎনা, বিবাহ, সাক্ষ্য, উত্তরাধিকার, পর্দা, পোশাক, ইমামতি, হজ্জ, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, অপরাধের শাস্তি, কারাবরণ, মৃত্যুর পর গোসল ও জানাজাসহ আরো অনেক ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের জন্য তার লিঙ্গ পরিচয় জানা আবশ্যক। কারণ এ সকল বিষয়ে পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু আবহমান কাল ধরে হয়ে আসা নারী পুরুষের এই লিঙ্গ ভিত্তিক পার্থক্য অস্বীকার করে ট্রানজেন্ডারবাদ নামক মতবাদের উদয় হয়েছে। যা মূলত পাশ্চাত্যের একটি ধারণা এবং বর্তমান সময়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় বা সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করে যাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হয়। এটি এমন একটি ফেতনা যা মুসলিম জাহানের দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং একটি অভিশপ্ত সভ্যতা বিস্তারের কাজ করছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ কে প্রশ্রয় দেওয়া মানে পুরো সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা গোষ্ঠী কেউ যদি এই মতবাদের পক্ষে অবস্থান করে, তাদের মতবাদ কে সমর্থন করে, আইন প্রনয়ণ করতে সাহায্য করে বা আইনি বৈধতা দেয়, তাহলে তারা প্রত্যেকেই কুরআন সুন্নাহকে বর্জন করলো এবং শরীয়াতের বিধানকে অস্বীকার করলো। তাই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। তাই লজ্জা না করে ধর্মীয় রীতিনীতি আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, পরিবার-সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে সঠিক তথ্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

ট্রান্সজেন্ডার কি?

আভিধানিক অর্থ :

'ট্রান্সজেন্ডার' (Transgender) Trans এবং Gender যোগে গঠিত একটি শব্দ। Trans অর্থ হল রূপান্তরিত। Gender অর্থ লিঙ্গ। সুতরাং 'ট্রান্সজেন্ডার' মানে হল রূপান্তরিত লিঙ্গ। ট্রান্সজেন্ডারকে সংক্ষিপ্তাকারে কখনো শুধু ট্রান্সও বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ :

পরিভাষায় ট্রান্সজেন্ডার হল এমন ব্যক্তি, যার মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন থেকে ভিন্ন।অর্থাৎ, যখন একজন ব্যক্তির জন্মগত লিঙ্গ (যেমন পুরুষ বা মহিলা) এবং তার লিঙ্গবোধ (মানসিক অনুভূতি) সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, তখন তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলা হলেন এমন একজন যিনি জন্মের সময় পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হলেও নিজেকে নারী মনে করেন। যদিও পুরুষ হওয়ায় শারীরিক কোনো ত্রুটি থাকে না।

লিঙ্গ পরিচয় বা লিঙ্গ বোধ : এটি ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি, যেখানে জন্মগত লিঙ্গ বা শারীরিক গঠন কোনো ভূমিকা রাখে না। তারা শুধু মাত্র নিজস্ব অনুভূতির জন্য তাদের লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন করে থাকে বা লিঙ্গ সার্জারী করে থাকে। এজন্য ডাক্তারি বা অস্ত্রোপচারের সহায়তা নেন, তাদের অনেক সময় রূপান্তরকামীও বলা হয়।

ট্রান্সজেন্ডার মহিলা: যিনি জন্মগতভাবে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত অর্থাৎ শারীরিক ভাবে পুরুষ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানসিক অনুভূতি অনুযায়ী নিজেকে নারী হিসেবে পরিচয় দেন।

ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ: যিনি জন্মগতভাবে মহিলা হিসেবে চিহ্নিত এবং শারীরিক ভাবেও স্ত্রী লিঙ্গ ধারন করেন কিন্তু নিজস্ব মানসিকতার জন্য নিজেকে পুরুষ হিসেবে পরিচয় দেন।

যারা নিজেকে ট্রান্স পুরুষ অথবা ট্রান্স মহিলা হিসেবে দাবী করে এরা মুলত মানসিকভাবে বিকৃত মানুষ। বিকৃত মস্তিক তাদের শারীরিক বিকৃতির দিকে পৌছায় যার ফলে নিজের মনের অনুভব থেকে লিঙ্গ রুপান্তর করে।

কেউ কেউ আবার লিঙ্গ রুপান্তর ছাড়াই নিজেকে ট্রান্স হিসেবে দাবী করেন।

লিঙ্গ সার্জারি বা রূপান্তর

প্রায় সময় মিডিয়াগুলোকে প্রচার করতে দেখা যায় যে লিঙ্গ পরিবর্তন বা সার্জারির মাধ্যমে নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারী হওয়া যায়। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির মাধ্যমে কেউ আসলে নারী থেকে পুরুষ কিংবা পুরুষ থেকে নারীতে পরিবর্তন হয়

না। এগুলো মূলত কসমেটিক সার্জারি। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন আনা যায়। কিন্তু প্রজনন ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যায় না। যার জন্ম হয়েছে পুরুষ হিসেবে শত অস্ত্রোপচার করা হলেও সে কখনো সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। তেমনিভাবে যার জন্ম হয়েছে নারী হিসেবে শত অস্ত্রোপচার করা হলেও তার শরীর কখনো বীর্য উৎপাদন করতে পারবে না। মোটকথা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি মানে হল অপারেশন করে তার বুকে কৃত্রিম স্তন বসানো, তার অণ্ডকোষ ফেলে দেওয়া ,পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা। অন্যদিকে নারীদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তন এর অর্থ হলো তার স্তন কেটে বাদ দেওয়া, শরীর থেকে গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অংশ কেটে ফেলে দেওয়া। কৃত্রিম যোনি কিংবা কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ কোনটাই সত্যিকারের অঙ্গের মতো কাজ করে না। প্রজননের ক্ষেত্রেও না,আর যৌনতার ক্ষেত্রেও না।

হরমোন ট্রিটমেন্ট :

লিঙ্গ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হরমোন ট্রিটমেন্ট। পুরুষের জন্য দ্বায়ী প্রধান হরমোন হলো টেস্টোসটেরন। এই হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধির সময় পুরুষের কণ্ঠ ভারী হয়, দাড়ি গজায়, শরীরে লোম গজায়, মাংসপেশী ও হারের ঘনত্ব বাড়ে। অন্যদিকে নারীদের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন হলো ইস্ট্রোজেন যা বয়:সন্ধির সময়ে নারীর দেহে আসা পরিবর্তনগুলোর জন্য দায়ী। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের সময় পুরুষের ইস্ট্রোজেন এবং নারীদের টেস্টোসটেরন দেওয়া হয় উচ্চ পরিমাণে। অর্থাৎ তাদের দেহে বিপরীত লিঙ্গের হরমোন ঢোকানো হয়। টেস্টোসটেরনের প্রভাবে নারীদের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে, চুল পড়তে শুরু করে, শরীরে কমনীয়তা কমে ও পেশি কিছুটা বাড়ে। অন্যদিকে পুরুষদেহে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে পুরুষের কণ্ঠ চিকন হয়ে আসে, শরীরের চর্বি বারে এবং শারীরিকভাবে তার অবয়ব পুরুষের তুলনায় গোলগাল হতে শুরু করে। কিন্তু যতই হরমোন দেওয়া হোক না কেন এতে করে একজন পুরুষ নারী হয় না অথবা একজন নারী পুরুষও হয় না। এতে করে কেবল বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন আসে সেই সাথে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক জটিলতা। পশ্চিমা বিশ্বের নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করা লোকদের একটা বড় অংশই হরমোন ট্রিটমেন্ট ও সার্জারি করে না। ট্রানজেন্ডার দাবিদারদের মধ্যে অর্ধেকের মত হরমোন ট্রিটমেন্ট নেয় আর লিঙ্গ সার্জারি করে মাত্র ২৫ %এর মত।

ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবিকারীদের কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না। তাদের মনে হয় তারা বিপরীত লিঙ্গের, কিন্তু ভুল শরীরে তারা আটকা পড়েছে। এ জন্য অপারেশন করে বা হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অথবা এসব কোনো কিছু ছাড়াই তারা নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষ বলে দাবি করে এবং তাদের এ দাবির সামাজিক ও আইনি স্বীকৃতি

দাবি করে। মূলত অপারেশন করে (gender reassignment) কিংবা হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দেহে বিপরীত লিঙ্গের জননাঙ্গ স্থাপন করা সুস্পষ্টভাবে হারাম, যা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেন-

'শয়তান বলল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেবো; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেবো।' (সূরা নিসা : ১১৮-১১৯)

আর সম্পূর্ণ শারীরিক সুস্থতা নিয়ে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দাবি করা এবং আচার-আচরণ করাকেও হাদিসে অভিশপ্ত কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা: বলেন, রাসূল সা: নারীর বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। (বুখারি-৫৮৮৫)

ইসলামি দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে বিস্তারিত পরবর্তীতে আরও জানবো ইংশাআল্লাহ।

এলজিবিটিকিউ এর ধারনা

এলজিবিটিকিউ (LGBTQ++) একটি ছাতা বা আমব্রেলা টার্ম যেখানে লেসবিয়ান, গে,বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ারসহ আরো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। এলজিবিটিকিউ এর বিভিন্ন পরিচয় :

লেসবিয়ান : লেসবিয়ান হলো দুই নারীর মাঝে যৌন সম্পর্ক ও আকর্ষন অর্থাৎ এরা হলো সমকামী নারী।

গে (Gay) : এরা হলো দুই পুরুষের মাঝে যৌন আকর্ষণ ও সম্পর্ক অর্থাৎ সমকামী পুরুষ।

বাইসেক্সুয়াল : এরা হলো উভকামী, অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে।

ট্রান্সজেন্ডার : যে একজন পুরুষ কিন্তু নিজেকে নারী মনে করে অথবা একজন নারী যে নিজেকে পুরুষ মনে করে।

ট্রান্সসেক্সুয়াল : যারা অস্ত্রোপচার বা হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে নতুন জেন্ডার পরিচয় গ্রহণ করে। সব ট্রান্সসেক্সুয়ালরাই ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে কিন্তু সব ট্রান্সজেন্ডার ট্রান্সসেক্সুয়াল নয়।

কুইয়ার: এটি মূলত ট্রানজেন্ডার, এলজিবিটি এবং নন-বাইনারি পরিচয়ের প্রতিশব্দ । এরা প্রচলিত লিঙ্গ পরিচয় নারী বা পুরুষ প্রশ্ন তোলেন যদিও নিজেদের পরিচয় নিয়ে কোন লিঙ্গ নির্ধারণ করেন না। বাইসেক্সুয়াল, পেনসেক্সুয়াল, অ্যাজেন্ডার কুইয়ারের অন্তর্ভুক্ত ।
নন-বাইনারি : এরা মূলত নিজেদেরকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে না। এর বাইরে অবস্থানকারী কিছু হিসেবে বিবেচনা করে।

হিজড়া বা ইন্টারসেক্স

আমাদের সমাজে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের সাথে অনেকেই ট্রান্সজেন্ডারকে গুলিয়ে ফেলেন। অধিকাংশই মনে করেন ট্রান্সজেন্ডারবাদ হয়তো হিজড়াদের অধিকারের কোন আন্দোলন। কিন্তু বাস্তবে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার এক নয়।

একটি শিশু যখন জন্মগ্রহন করে তখন সামাজিকভাবে কিংবা মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী শিশুটি ছেলে অথবা মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত হয়। বায়োলজিকালি, ছেলে মেয়ের লিঙ্গ নির্ধারণের মূলত দুটি অপশন রয়েছে। জেনেটিক্যালি শুক্রাণু বহন করে X অথবা Y ক্রোমোজোম। অন্যদিকে ডিম্বাণু বহন করে X ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের বিন্যাস XX হলে শিশুটি মেয়ে হিসেবে নির্ধারিত হয় এবং ক্রোমোজমের বিন্যাস XY হলে শিশুটি ছেলে হিসেবে নির্ধারিত হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে X ও Y ক্রোমোজমের বিন্যাস ঠিক থাকার পরেও জিনগত ত্রুটি বা মিউটেশনের ফলে ছেলে অথবা মেয়ের বৈশিষ্ট্যে তারতম্য হতে পারে।
আবার হরমোনাল ভারসাম্যহীনতাও এর জন্য দায়ী। আমরা জানি পুরুষদেহের শারীরিক গঠন ও যৌনতার বিকাশে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন দায়ী আবার নারী দেহের শারীরিক গঠন ও যৌনতার জন্য ইস্ট্রোজেন হরমোন দায়ী। কখনো কখনো হরমোনের পরিমাগত কারণে নারী-পুরুষ বৈশিষ্ট্যে তারতম্য দেখা যায়।
যে সমস্ত শিশুদের জিনোটাইপের (XY ও XX chromosome) সাথে ফেনোটাইপের বৈশিষ্ট্য (বাহ্যিকভাবে ছেলেমেয়েদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝা যায়) বা বহিঃযৌনাঙ্গের (External genitalia) অসামঞ্জস্য বা অমিল থাকে (ইন্টারসেক্সদের ক্ষেত্রে XXY বা XYY) তাদেরকে 'প্রকৃত ইন্টারসেক্স' বা 'উভলিঙ্গ মানব' বলে। জিন বা হরমোনগত ত্রুটির কারণে আরো বিভিন্ন ধরনের যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইন্টারসেক্স মানুষ ব্যাহিকভাবে নারী বা পুরুষের মতো দেখতে হলেও, তারা প্রজনন ক্ষমতায় অক্ষম। তারা মুলত লিঙ্গ প্রতিবন্ধী।

হিজড়া শনাক্তকরণ : যে সমস্ত শিশুর যৌনাঙ্গ স্পষ্ট নয় তারাই মুলত ইন্টারসেক্স। একটি শিশু ইন্টারসেক্স কি না, তা জন্মের পরপরই বোঝা যায়। তবে বেশির ভাগ সমস্যা দেখা দেয় বয়ঃসন্ধি বা পিউবার্টির সময়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ২০-২৫ বছর বয়সেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইন্টারসেক্স মানুষদের সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা নেই। কেননা তারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধকতা জনিত ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। ডাক্তারি পরীক্ষায় বাহ্যিকভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গের গঠন ও গড়ন দেখে প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। এক্সরে এন্ড ইমেজিং বিভাগ ও নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগে আলট্রাসনোগ্রাম ও এক্সটার্নাল জেনিটাল অর্গান পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় ক্যারিওটাইপিং পরীক্ষার মাধ্যমে।

অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিভিটি সিনড্রোম : এটি ইন্টারসেক্স অবস্থা ও একটি বিরল রোগ। এ ধরনের শিশুরা জিনগতভাবে পুরুষ(XY) হলেও তারা দেখতে অবিকল মেয়েদের মত। তাদের বহিঃযৌনাঙ্গ (যোনি ও ক্লাইটোরিস) থাকলেও তাদের জরায়ু ও ডিম্বাশয় থাকে না। একারনে বয়ঃসন্ধি বয়স পার হয়েও তাদের মাসিক (Menstruation) হয় না। অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর নামক একটি জিনে ত্রুটির কারণে তাদের শরীরে অ্যান্ড্রোজেন (ছেলেদের হরমোন) কাজ করতে পারে না।

হিজড়া বনাম ট্রান্সজেন্ডার

বাংলাদেশের মিডিয়া কিংবা অনেক সেলেব্রিটিরা কিংবা সাধারণ মানুষ হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় দুটিকে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবেও হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার এক নয়। হিজড়া বা ইন্টারসেক্স হলো তারা, যারা লিঙ্গত্রুটি বা লিঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মায়। যেখানে মানুষের ইচ্ছা বা মনের কোনো সংযুক্ততা নেই। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার একটি বিকৃত মানসিক সমস্যা। শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ সবল নারী বা পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা মনে মনে নিজেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হিসেবে দাবী করে এবং সামাজিকভাবে তা প্রতিষ্ঠার দাবী তোলে।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য :

১। হিজড়ার শারীরিক অস্বাভাবিকতা আল্লাহ প্রদত্ত। যেখানে তাদের কোনো ক্ষমতা বা হাত নেই। অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডারদের শারীরিক কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এর ভিত্তি হলো

বিকৃত মানসিকতা, প্রতারণা ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপর।

২। হিজড়া হওয়া জন্মগত ত্রুটি। ল্যাবটেস্ট করে জেনেটিক সমস্যার বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারের জন্মগত কোনো ত্রুটি নেই।

৩। হিজড়া জন্মগতভাবে অনেকাংশেই সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডাররা সন্তান জন্মদানে পুরোপুরি সক্ষম থাকে। সার্জারি করার দ্বারা তা নষ্ট করে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

শরীয় দৃষ্টিতে হিজড়াদের অবস্থান

নারী পুরুষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শারীরিক লিঙ্গ চিহ্নের বাইরে মানসিক বোধকে লিঙ্গ পরিচয়ের মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানো সকল আসমানী শরীয়ত এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত বিরোধী। এটি শুরু হয় অমুসলিমদের কাছ থেকে। ইসলামে কেবল দু'টি লিঙ্গ স্বীকৃত : পুরুষ ও নারী। কুরআনের অনেক আয়াতের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী।' (৫৩:৪৫)
'এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।' (৯২:৩)

সুতরাং, হিজড়ারাও মুলত নারী অথবা পুরুষ। যে বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকাশিত হয় হিজড়াদের মুলত সেই পর্যায়ে রাখা যায়। যেমন নারী বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকাশিত হলে নারী ধরা হয়। আর পুরুষ বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকাশিত হলে পুরুষ ধরা হয়।

তৃতীয় কোনো লিঙ্গের স্বীকৃতি ইসলাম দেয় না। হিজড়া বলে যারা পরিচিত তাদের জন্মগত শারীরিক বৈকল্য বা ত্রুটি থাকে। বিভিন্ন শারীরিক চিহ্ন দেখে তাদের লিঙ্গ পুরুষ কিংবা নারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। শারীরিকভাবে ত্রুটি নিয়ে জন্মানো হিজড়াদের ইসলাম দুই ভাগে ভাগ করেছে : ১. খুনছা আল মুশকিল এবং ২. মুখান্নাছ খিলকি। খুনছা আল মুশকিল শ্রেণীর হিজড়ারা দুই লিঙ্গের অবিকশিত প্রজনন অঙ্গ নিয়েই বা কোনোটি ছাড়াই জন্মায়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রস্রাব করার রাস্তা দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপ্রাথমিক লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য (secondary sexual characteristics) যেমন- বুকের আকার, লোম-শ্মশ্রু এসব

দেখে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী তথা মুখান্নাছ খিলকি হচ্ছেন সেসব হিজড়া যাদের জননাঙ্গে কোনো ত্রুটি না থাকলেও চলাফেরা, কণ্ঠ, ভাবভঙ্গিমায় অনিচ্ছাকৃতভাবে ও জন্মগতভাবে বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় বলে মুখান্নাছ খিলকি। তাদের জননাঙ্গ দেখেই তাদের লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের বিপরীত লিঙ্গ-সুলভ বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা নিন্দিত হন না, যেহেতু জন্মগত হওয়ায় তা তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। এভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে ইসলাম হিজড়া জনগোষ্ঠীকে যেকোনো ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্য থেকে রক্ষা করে।

মানবজাতির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ আছেন যারা প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি নিয়ে নিয়ে জন্মায়। এই ধরনের মানুষ বোঝাতেই 'ইন্টারসেক্স লিঙ্গ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে মূলত ইন্টারসেক্স বুঝিয়ে থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হন। অন্যদিকে, ৯৯.৯৮% মানুষ স্বাভাবিক শরীর নিয়ে জন্মায়। তাই হিজড়ারা বা ইন্টারসেক্স তৃতীয় কোন লিঙ্গ নয় বা দুটোর মাঝামাঝি কিছু নয়। এরা হলো লিঙ্গের গঠন ও জিনগত ত্রুটি নিয়ে জন্মানো মানুষ। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মত এটি হচ্ছে লিঙ্গ সম্পর্কিত ত্রুটি। কেউ যখন শারীরিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে কোনো ত্রুটি নিয়ে জন্মায় তাকে আমরা বলি প্রতিবন্ধী।যেমন : দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। তেমনিভাবে হিজড়া মুলত লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। কেননা লিঙ্গ ত্রুটি বিচ্যুতির ফলেই হিজড়া বা ইন্টারসেক্সের উৎপত্তি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিজড়া

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক ধারণার প্রতিচ্ছবি হিসেবে ২০১৩ সালে গৃহীত সরকারের নীতিতে হিজড়াদের লিঙ্গ প্রতিবন্ধী (যা জেনেটিক বা হরমোনাল ত্রুটিজনিত হতে পারে) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতের সাধারণ জনগণও এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করে । তবে পশ্চিমা একাডেমীশিয়ান এবং দেশীয় এলজিবিটি ও অ্যাকটিভিস্টরা হিজড়াদের সংজ্ঞা পাল্টে তাদের সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যেখানে জন্মগত লিঙ্গ ত্রুটির বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। এই আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী যে কেউ হিজড়া হতে পারে যদি তারা হিজড়া সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ :

দলবদ্ধ জীবন যাপন : হিজড়া সম্প্রদায়ের গুরু মায়ের অধীনে চ্যালা হিসেবে দলবদ্ধভাবে বসবাস করা।

হিজড়াগিরি: মেয়েদের পোশাক পরে নাচ গান করা। ট্রেন, বাস বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বকশিশ হিসেবে অর্থ উপার্জন করা।

বিয়ের অনুষ্ঠানে চাঁদাবাজি: গ্রাম বা শহরের বিয়েতে গিয়ে উপস্থিত লোকদের বিনোদন দেওয়া এবং বকশিশ নেওয়া।

শিশু জন্মের সময় আশীর্বাদ : নবজাতকের খবর পেলে সেখানে যেয়ে বকশিশ আদায় করা।

যৌনকর্ম: যৌনকর্মের মাধ্যমে উপার্জন করা এবং এই ক্ষেত্রে ঢেরায় না থেকেও হিজড়া গ্রুপে এলাকাভিত্তিক চাঁদা প্রদান করা।

হাততালি দেওয়া বিশেষ প্রথা: বিভিন্ন অনুভুতি যেমন রাগ ক্ষোভ জানাতে বিশেষ ধরনের হাততালি দেওয়া যা প্রায় ২০০০ বছর ধরে প্রচলিত।

হিজড়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণী :

বাংলাদেশের হিজড়া দলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। যেমন :

আকুয়া (ট্রান্সজেন্ডার নারী) : এই দল এমন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত যারা নারী সাজতে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে নারী হিসেবে কল্পনা করে মানসিক তৃপ্তি পায়। আকুয়া হিজড়াদের লিঙ্গ রূপান্তরকামী ট্রান্স উইমেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

জেনানা (ট্রান্সজেন্ডার): জেনানারা মেয়েদের সাজে সজ্জিত পুরুষ তবে এদের আকুয়া বলা যায় না। কারণ তারা নারীর বেশে মানসিক সুখ লাভ করে না। কিছু সুবিধা ভোগের জন্য তারা হিজড়া সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দেয়। জেনানারা দুই ধরনের হতে পারে। (ক) যৌন ক্ষমতাহীন জেনানা এবং (খ) যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন জেনানা। এরা মানসিকভাবে সুস্থ এবং অনেকের স্ত্রী সন্তানও রয়েছে। হিজড়াপাড়ায় বেড়ে উঠলেও এরা ভেজাল বা ফেক হিজড়া।

নারী সদস্য বা ছিবড়ি : পুরুষকেন্দ্রিক হিজড়া সম্প্রদায়ে কিছু নারী সদস্য থাকে যাদের শারীরিক বা মানসিক ত্রুটি নেই। এদেরকে ছিবড়ি বলা হয়। এরা অধিকাংশই বিবাহিত বা স্বামী পরিত্যাক্তা। এমন কি কেউ কেউ সন্তানসহ বসবাস করে।

ছিন্নি বা (ট্রান্সজেন্ডার নারী): ছিন্নিরা পুরুষাঙ্গ কর্তন করা খোজা হিজড়া। এরা রূপান্তরকামী ট্রান্স উইমেন যারা নিজেকে পরিপূর্ণ নারী হিসেবে কল্পনা করে। কেউ কেউ হরমোন থেরাপি বা সার্জারির মাধ্যমে পুরুষাঙ্গের বা শারীরিক রূপান্তর ঘটায় । তাদের মধ্যে এমন মানসিকতা থাকে যা বিকৃত মানসিকতা বা চিন্তাভাবনার প্রকাশ করে। ছিন্নিরা হিজড়া মহল্লায় বসবাস না করলে হিজড়া পরিচয় নিতে পারে না। অনেক সময় জোরপূর্বক লিঙ্গচ্ছেদের ঘটনাও

ঘটে। সেখানে ছেলে শিশু, কিশোর ও যুবকদের অপহরণ করে তাদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে স্থায়ীভাবে হিজড়া তে পরিণত করে এবং তাদের দিয়ে ব্যবসা করানো হয়।

ইন্টারসেক্স : এরা মূলত লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। কিন্তু হিজড়া পল্লীতে লিঙ্গ প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা খুবই বিরল।

আইনি ও সামাজিক স্বীকৃতি

২০১৩ সালে ১১ই নভেম্বর হিজড়া জনগোষ্ঠীকে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করে স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি ২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি 'রবিবার ' বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারী একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তাদেরকে সরকারি বলে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এখন তারা নারী ও পুরুষদের পাশাপাশি নিজস্ব পরিচয়ের সরকারি বিভিন্ন সুবিধা যেমন : পাসপোর্ট এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা পেতে পারে।

হিজড়া চিহ্নিতকরণের সরকারি নীতি :

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য হিজড়া চিহ্নিতকরণের বিষয়টি অপরিহার্য। কেননা অনেকেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদেরকে হিজড়া বলে পরিচয় দেয়। অনেকেই স্ত্রী সন্তান থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে হিজড়া হিসেবে প্রদর্শন করে। ভিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। তাই এই সমস্যা নিরোধের লক্ষ্যে প্রকৃত হিজড়া সনাক্তকরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট মাঠ পর্যায়ে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী, দেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১০ থেকে ১১ হাজার। তবে বেসরকারি হিসেবে তা আরও বেশি।

হিজড়ার অনৈতিকতায় মিডিয়ার কিছু প্রতিবেদন :

"ঢাকায় ৯০ ভাগই নকল হিজড়া" : এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান সজনী নামক একজন হিজড়া তার মতো আরও সাত থেকে আট জনকে নিয়ে তৈরি করেন নকল হিজড়া গ্রুপ। যাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট, বাসা-বাড়ি দোকান-পাট থেকে শুরু

করে যেখানে সেখানে মানুষকে টাকার জন্য নাজেহাল করা। আরো জানান, ঢাকার ৯০ ভাগই নকল হিজড়া।

"১৫ বছর ধরে পুরুষদের হিজড়া বানাতেন ভুয়া ডাক্তার হাদিউজ্জামান ":

পিবিআই ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার কুদরত-ই- খুদা বলেন, ঘটনার অনুসন্ধানে নেমে দেখা যায় সমাজে হিজড়া হিসেবে পরিচিতদের ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশই ভুয়া। এদের মধ্যে তিনটি ধরন রয়েছে। একটি হলো হরমোন ইঞ্জেকশন ও অন্যান্য ওষুধ দিয়ে পুরুষ থেকে নারীতে রুপান্তর। আরেকটি ধরন হচ্ছে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারীতে রুপান্তর। আবার কিছু ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ও ওষুধ-ইনজেকশন দুই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর বাইরে থাকা মাত্র ৫-১০% জন্মগতভাবে হিজড়া হয়ে থাকে ।

কওমে লূত (আঃ)-এর পরিণতি

চার হাজার বছর পূর্বে সমকামিতা নিয়ে প্রথম আলোচনা হয় ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সময়ে। এই ঘটনা কওমে লুত ঘটনাবলী হিসেবে পরিচিত। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আপন ভাতিজা ছিলেন লুত ইবনে হারান। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠান। কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পপুত্র লুত মুসলিম হন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌছার পর আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই বসতি স্থাপন করেন।

বাইবেল এবং কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী লুত আলাইহিসসালাম সাদুম ও গোমরাহ শহরের অধিবাসীদের নবী হিসেবে প্রেরিত হন। কুরআনে উল্লিখিত ২৫ জন নবীর অন্যতম নবী লুত আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তায়ালা লুত আ: এর সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য তাকে নিয়োজিত করেছিলেন। তার সম্প্রদায় সমকামিতা নামক জঘন্য অপরাধে লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তার সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের ৭০ টির বেশি আয়াতে

লুত আ: এর সম্প্রদায়ের সীমালংঘন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পাঠানো শাস্তির আলোচনা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, " আর লুত কে আমি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি। তারপর স্মরণ করো, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, "তোমরা কি এতই লজ্জাহীন হয়ে গেলে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ কখনো করেনি এমন অশ্লীল কাজ করছো? তোমরা কি নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে যৌনাচার করছো? তোমরা তো একেবারেই সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী" কিন্তু তার সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল, "এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও ;এরা পবিত্রতার ধ্বজাধারী হওয়ার ভান করে।" শেষ পর্যন্ত আমি লুত আলাইহিস সালাম এবং তার অনুসারী পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি, শুধুমাত্র তার স্ত্রী বাদ দিয়ে, কারণ সে পেছনে থাকা অন্যদের সঙ্গেই ছিল। পরে আমি তাদের ওপর ধ্বংসের বৃষ্টি বর্ষণ করি। তারপর সেই অপরাধীদের কি পরিণতি হয়েছিল দেখো? " (সূরা আরাফ , ৮০-৮৪)।

'স্মরণ করো লুতের কথা, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, "তোমরা কেন এমন অশ্লীল কাজ করছো, যার পরিণতির কথা তোমরা জানো না? তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের সাথে যৌনাচার করবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। " উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় বলল, "লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, কারণ তারা নিজেদের পবিত্রতার ভান করে। " এরপর লুত আলাইহিসসালাম ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে, কারণ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকার জন্য নির্ধারিত ছিল। " (সূরা নামল, ৫৪-৫৭)

হাতে গোণা কয়েকজন মুসলিম ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা লুত 'আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। লুত আলাইহিস সালাম এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তার স্ত্রী প্রসঙ্গে দু'রকম বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, কিছু দূর সঙ্গে গিয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল।

কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাদের উপর আপতিত আযাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যখন আমার আযাব এসে

গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি কাফেরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। সূরা আল হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে, সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। সূরা হুদের বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে আল্লাহ্ তা হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, উল্টে দেয়া বস্তিগুলো যালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। এ দৃশ্য শুধু কুরআন নাযিলের সময়েরই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লুত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিতি। এর ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরণের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদূমের অবস্থান স্থল। [ড. শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৫৭-৬১]

বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্দান বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। এ এলাকা এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করত। কিন্তু আজ এ জাতির নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।

কুরআন তাদের তিনটি প্রধান পাপ কর্মের উল্লেখ করেছে। (১) পুংমৈথুন (২) রাহাজানি এবং (৩) প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা *(আনকাবূত ২৯/২৯)*।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

» إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ . «

‘আমি আমার উম্মাতের ওপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের আশঙ্কা করি, তা হলো লূত (আঃ)-এর গোত্রের কুকর্ম (সমকামিতা)। (তিরমিযী হা/১৪৫৭, ইবনু মাজাহ হা/২৫৬৩, মিশকাত হা/৩৫৭৭)

রসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না, যে সমকামে লিপ্ত হয়। ' (ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস নং- ১৬৮০৩, তিরমিযী, হাদিস নং- ১১৬৫)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কোন জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কওমে লুতের অনুরূপ করে। ' (মুসনাদ ইমাম আহমাদ, সহীহ আল-জামি'আল আলবানী)

ত্বীবী (রহঃ) বলেনঃ এটা এমন একটি সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি, যে জাতির মধ্যে এ রোগ দেখা দেয় সে জাতি অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুত সে জাতি নৈতিক দেওলিয়াপনায় পৌঁছে যায়। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খন্ড, হাঃ ১৪৫৭) তবে এ শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের *(কুরতুবী)*।

ইসলামের দিক থেকে সমকামিতা শুধু হারামই নয় বরং গুনাহের মধ্যে অত্যন্ত গর্হিত পাপ ও চরম পর্যায়ের সীমালংঘন। যারা এই কাজে লিপ্ত আল্লাহ ও রসূল (সা:) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। ট্রান্সজেন্ডারবাদ হলো কওমে লুতের আধুনিক সংস্করণ। কাজেই একজন মুসলিমের পক্ষে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে মেনে নেওয়া উচিত নয়।
ইসলাম ধর্মে সমকামী আচরণ কে সর্বদাই চরম গর্হিত কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৪০০ বছর পরেও এখনো তার কোন পরিবর্তন আসেনি। যদিও খ্রিস্টান ধর্ম সহ অন্যান্য বেশিরভাগ ধর্মে একসময় সমকামীতাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ

ট্রান্সজেন্ডারবাদ এমন একটি মতবাদ যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, একজন পুরুষের যদি নিজেকে নারী মনে হয় ,তাহলে সে নারী। আবার কোনো নারীরও যদি নিজেকে পুরুষ মনে

হয়, তাহলে সে পুরুষ। আর তাদের দাবী হলো সমাজ ও আইন তাদেরকে সে হিসেবেই বিবেচনা করবে এবং তারা চিকিৎসার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করারও অধিকার রাখে। এমন ঘৃন্য মতবাদের নাম হলো ট্রান্সজেন্ডারবাদ।

ইউরোপীয় রেনেঁসা পরবর্তী চড়াই উৎরাই শেষে সভ্যতা আজ এমন অবস্থায় দাড়িয়েছে যে, পশ্চিমারা আমাদেরকে দু'মুঠো অখাদ্য-কুখাদ্য যাই দিচ্ছে, উন্নত সংস্কৃতি ভেবে আমরা তা দেদারসে গলাধঃকরণ করছি। ফলে দু'টি মৌলিক পতনমুখী পশ্চিমা সভ্যতাকে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি। এক. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে ভাল-মন্দের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা। দুই. ব্যক্তি স্বাধীনতা। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে নীতি দু'টি পরস্পর বিরোধী। তবুও স্বাধীনতা মানব জনমের পরম আরাধ্য বিষয়। তবে এ 'স্বাধীনতা'র সাথে বিভিন্ন শব্দ জুড়ে দিয়ে যেমন (বাকস্বাধীনতা, পোষাকের স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি) একটা গোষ্ঠী সুকৌশলে স্বীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে উদগ্রীব। ১৯৮০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া LGBTQ আন্দোলন মূলতঃ চারটি শব্দের আদ্যাক্ষর Lesbian (সমকামী নারী), Gay (সমকামী পুরুষ), Bisexual (উভয়কামী), Transgender (রুপান্তরিত লিঙ্গ), Queer (বিচিত্র লিঙ্গ আকর্ষণ)-এর সমন্বয়ে গঠিত। উল্লেখ্য, এই ট্রান্সজেন্ডার পরিভাষাটি এলজিবিটিকিউ তথা সমকামী আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার আরও পূর্বে ১৯৬৫ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

অনেকে একে জেন্ডার আইডেন্টিটি বলে থাকেন। এই মতবাদ অনুযায়ী একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী হবে সেটির সাথে তার দেহের কোন সম্পর্ক নেই। দেহ মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে না। পরিচয় নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সেটাই তার পরিচয়। এর সাথে লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ তাদের মতে Biological Sex এবং Gender identity সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জেন্ডার আসলে বর্ণের মতো। এখানে রয়েছে অসংখ্য রং। লিঙ্গ নয় বরং মনের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি নিজেকে নারী অথবা পুরুষ অথবা দু'টোই অথচ কোনটিই নয় অথবা নারী পুরুষের মাঝামাঝি কোন কিছু পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ। অর্থাৎ এই মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কোন পুরুষ যদি নিজেকে নারী বলে মনে করে তাহলে সে একজন নারী। সমাজিক আইনে সে নারী বলে স্বীকৃতি পাবে যদিও তিন বাচ্চার বাপ হোক। আমেরিকাতে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। ডেমি মাইনর নামে খুনের দায়ে দন্ড পাওয়া এক পুরুষ নিজেকে মেয়ে বলে দাবী করার কারণে আমেরিকার আদালত তাকে নারীদের জেলে পাঠায়। ডেমি মাইনর নারীদের জেলে দুইজন নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে তারা গর্ভবতী হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে আবার পুরুষদের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

অনুরূপভাবে এই মতবাদ অনুযায়ী কোন নারী যদি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে, তাহলে সে একজন পুরুষ হিসাবে গণ্য হবে। যদিও তার ঋতু হয়, সে ১০০ ভাগ সুস্থও হয় এবং তার এই মনে হওয়ার ভিত্তিতে সে বিভিন্ন হরমোন ট্রিটমেন্ট আর অপারেশনের মাধ্যমে বদলে ফেলতে পারবে তার শরীরকে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এখানে তার এমন মনে হওয়ার জন্য তার মানসিক চিকিৎসা করা হবে না; বরং তার শরীরকে বদলে দিতে হবে। আর এই পরিবর্তনের স্বীকৃতি দিতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। হিজড়াদের মতো তারাও সহানুভূতি পাবে সমাজের চোখে। এই লিঙ্গ পরিবর্তনে আইনি জটিলতা ও উত্তরাধিকারী সহ যাবতীয় সুরক্ষা প্রদানে আইন পাশ করানো, এটাই এক নযরে 'ট্রান্সজেন্ডারবাদ'।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস

মূলত ১৯৯০ সালের পর থেকে ট্রান্সজেন্ডার তথা জেন্ডার আইডেন্টিটি শব্দটি একটি গোষ্ঠী বা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা নন-বাইনারি ও এলজিবিটি-এর সমার্থক শব্দ। ১৯৬৫ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াটিস্ট প্রফেসর John F. Oliven ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটা (Transsexualismus) জার্মান শব্দ হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রবর্তন হয়। এরপর এই শব্দের বিবর্তন ঘটে Transsexual হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ছিল। শুরুর দিকে ট্রান্সজেন্ডার বলতে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে হরমোন ও সার্জারির আশ্রয় নিত, তাদেরকে বোঝানো হত। ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা এখন অনেক ব্যাপক; এমনকি যারা ক্রসড্রেসার (যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণকারী অর্থাৎ ছেলে যদি মেয়েদের ড্রেস পরতে আকর্ষিত হয়)। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা বর্তমানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না; মনের ইচ্ছাধীন বিষয়। অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারে। যেদিন থেকে কারো মনে হয় যে, সে জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী নয়, সেদিন থেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ এলজিবিটি এর একটি বিশেষ অঙ্গ বা শাখা। তাই এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে ট্রান্সজেন্ডারিজম এর ইতিহাস। সমকামিতা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা হয় ৪ হাজার বছর আগে লূত আ: এর কওমের ঘটনায়। এর পর কওমে লূতের ঘটনা ৪ হাজার বছর পরে সমকামিতা নতুনভাবে প্রজ্জ্বলিত হতে শুরু করে।

সমকামী পরিচয়ের অগ্রদূত

কওমে লুতের ঘটনার চার হাজার বছর পর ২৯ আগস্ট ১৮৬৭ সালে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। মিউনিকে জার্মান আইনজীবীদের একটি সম্মেলনে অংশ নিয়ে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস পায়ু সঙ্গম বিরোধী আইন বাতিলের দাবি জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই আইন প্রাকৃতিক 'যৌনতাড়না' চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে কিছু মানুষকে বৈষম্যের স্বীকার করছে। যদিও সম্মেলনে উপস্থিত ৫০০ আইনজীবী ও কর্মকর্তা দুয়ো দিয়ে তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। তবুও তিনি তার বক্তব্যকে সফল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

কার্ল উলরিখস ১৮২৫ সালের ২৮ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন লাজুক এবং কিছুটা অন্তর্মুখী ছিলেন। ছোট বয়সে উলরিখস তার স্কুলের এক পুরুষ প্রশিক্ষকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। যা পরবর্তীতে সারা জীবন তাকে তাড়িত করে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ' সিভিল ল'তে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। জেলা সহকারী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান ছোট্ট একটি শহরে। সেখানে সরাইখানা ও অন্ধকার গলির সন্দেহজনক লোকদের সান্নিধ্যে তাকে প্রায় দেখা যেত। শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং প্রমাণিত হয়। ফলে তিনি বরখাস্ত হন। এরপর থেকে তিনি তার যৌন প্রবৃতিকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। উলরিখস ১৮৬৪ সালে 'আর্নিং প্রেম' এর সমর্থনে একটি ছদ্মনামে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এসব প্রকাশনায় তিনি যৌন সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তার মতে আর্নিং (সমকামী) পুরুষদের সত্যিকারে পুরুষদের প্রতি আকর্ষণের কারণ হলো পুরুষদের দেহে আটকে থাকা নারীসুলভ আত্মা। পরবর্তীতে তার তত্ত্বটি এমন পুরুষদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে বিস্তৃত হয়, যারা পুরুষালী এবং পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট এবং এমন নারীদেরকেও যারা নারীদের ভালোবাসে। এই ধারণাগুলো পরবর্তীতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়।

১৮৬৭ সালে তিনি জনপরিসরে সমকামিতা অপরাধমুক্ত করার দাবি জানান। উলরিখসের কিছু তাত্ত্বিক ধারণা সমকামী অধিকার আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছে।

এজন্য উলরিখসকে সমকামী পরিচয়ের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে।

১৮৯৬ সালে ম্যাগনাস হার্শ ফিল্ড যখন বার্লিনে থাকা শুরু করেন, তখন শহরটি ইতিমধ্যেই সমকামী পুরুষ (গে) এবং নারী সমকামী (লেসবিয়ান) সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। উলরিখসের বপন করা সমকামী অধিকারী আন্দোলনের বীজ হার্শ ফিল্ডের নেতৃত্বে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ একটি বৃহৎ আন্দোলনে পরিনত হয়।

সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ

ম্যাগনাস হার্শ ফিল্ডকে সমকামী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়। হার্শ ফিল্ড উলরিখসের চেয়ে ৪০ বছরের ছোট ছিলেন। তিনি একটি ইহুদি পরিবারের সদস্য, যিনি একজন জার্মান সমকামী অধিকারকর্মী হিসেবে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আইনি অধিকার সুরক্ষার জন্য 'আইনস্টাইন অফ সেক্স' নামে খ্যাত হার্শফিল্ড ১৯১৯ সালে বিশ্বের প্রথম যৌনতা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র 'ইনস্টিটিউট ফর সেক্সুয়াল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম গবেষক হিসেবে দেখিয়েছিলেন যে সমকামীদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তিনি LGBTQ সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম কমিউনিটি হেলথ সেন্টারও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৭ সালে হার্শফিল্ড প্রথম এলজিবিটিকিউ অধিকার সংগঠন 'সাইন্টিফিক হিউম্যানিটারিয়ান কমিটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে জার্মানিতে সমকামিতা অপরাধমুক্তকরনের জন্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়, যেখানে ৬ হাজার জন স্বাক্ষরকারী সমর্থন ছিল। এই উদ্যোগে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন, ইহুদি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, দার্শনিক, একাডেমিক, শিল্পী এবং রাজনীতিবিদরা প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরের বছর এই বিষয়টি নিয়ে জার্মান সংসদে বিতর্ক হয়। কিন্তু তার সমকামিতা অপরাধ আইন বাতিলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর ফলে হার্শফিল্ডের কাজকে 'ইহুদি কামনা আগ্রাসী' কর্মকাণ্ড বলে আক্রমণ করা হয়।

এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে ট্রান্সজেন্ডারিজম এর ইতিহাস। মেডিসিনে পড়াশোনা শেষ করার পর হার্শ ফিল্ড আমেরিকার শিকাগো শহরে প্রায় আট মাস ব্যাপী সফর করেন এবং সমকামীদের উপসংস্কৃতি পর্যবেক্ষণ ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করেন। একাডেমিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বার্লিনে ‘আন্টি ম্যাগ্নেসিয়া’ নামে পরিচিত একজন ক্রসড্রেসার হিসেবে ড্রাগ পারফরম্যান্সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ঐতিহাসিকভাবে কিছু মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে এমন একটি প্রবণতা দেখা যেত যাকে বলা হয় ক্রসড্রেসিং যেখানে তারা নারীর পোশাক পরিধান করে মানসিক তৃপ্তি পেত। উল্লেখ্য ইসলামের ইতিহাসে রসূল সাঃ ক্রসড্রেসিং এর বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ক্রসড্রেসারদের একটি ক্ষুদ্র অংশ নারীর পোশাক পরিধান করে যৌন তৃপ্তি লাভ করে এবং তারা নিজেদেরকে শারীরিকভাবে নারী হিসেবে মনে করে। এর মধ্যে অনেকেই সাধারণ সমকামী বা উভকামী হন। হার্শফিল্ড এই ক্রসড্রেসারদের জন্য

ট্রান্সভেস্টাইটিস নামক নতুন একটি পরিভাষা প্রবর্তন করেন। তিনি রুডলফ রিচটার নামে একজন ক্রসড্রেসার এর উপর গবেষণা করেন। তিনি দরিদ্র পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। হার্শফিল্ড প্রথমে তাকে নারীতে রূপান্তর করার জন্য লিঙ্গচ্ছেদন (খোজাকরণ) করেন এবং প্রায় ১০ বছর পর কৃত্রিম যোনি প্রতিস্থাপন করেন।

হার্শফিল্ড নারী এবং পুরুষের ধারণাকে একটি বিমূর্ত ধারণা হিসেবে দেখতেন। তিনি মনে করতেন সমকামী এবং ট্রান্সভেস্টাইটিসরা প্রচলিত দ্বিলিঙ্গ মডেল থেকে বিচ্যুত এবং তাই তাদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৯৩০ সালে হার্শফিল্ড ডেনমার্কের একজন পুরুষ আইনার ওয়েগনারের লিঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি অস্ট্রিয়ান এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ইউজেন স্টেইনাচের থেকে এই কাজে অনুপ্রাণিত হন, যিনি পুরুষ গিনিপিক থেকে টেস্টিস এবং নারী গিনিপিগ থেকে ওভারিস প্রতিস্থাপন করেছিলেন। হার্শফিল্ড ওয়েগনারের খোজাকরণ করে কৃত্রিম যোনী স্থাপন করেন। তবে লিলি রূপান্তরের দেড় বছর পর মারা যান। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর হার্শফিল্ডের লাইব্রেরী এবং গবেষণাকেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যার ফলে লিঙ্গ পরিবর্তন ইস্যুটি প্রায় ২০ বছরের জন্য চাপা পড়ে।

আমেরিকার প্রথম ট্রান্সজেন্ডার ক্রিস্টিন জর্গেনসেন। ১৯৫২ সালে প্রথম আমেরিকান পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া ক্রিস্টিন জর্গেনসেন এর ঘটনা ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমেরিকার আর্মিতে কর্মরত ২৬ বছর বয়সী ক্রিস্টিন জর্গেনসেন ছিলেন সমকামী এবং নিজেকে নারী হিসেবে কল্পনা করতেন। হরমোন সম্পর্কিত বই পড়ার পর তিনি সম্ভাব্য লিঙ্গ রূপান্তরের কথা জানতে পারেন এবং ডেনমার্কের এন্ড্রোক্রাইনোলজিস্ট ক্রিশ্চিয়ান হ্যার্মবার্গারের সাথে পরামর্শ করতে যান। এই চিকিৎসক হার্শফিল্ডের কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং ট্রান্সভেস্টাইটিস নির্ণয়ের জন্য হরমোন থেরাপি দিতেন।

১৯৫০ এর দশক থেকে হার্শফিল্ডের এলজিবিটি আন্দোলনের মশাল গ্রহণ করেন দুই সমকামী বা বাইসেক্সুয়াল, একাডেমিক প্রফেসর আলফ্রেড কিনসি এবং প্রফেসর জন মানি।

যৌন বিপ্লবের জনক

আলফ্রেড কিনসিকে যৌন বিপ্লবের জনক বলা হয়। আলফ্রেড কিনসি দাবি করেছিলেন যে, যেসব যৌন আচরণকে বিকৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেগুলো স্বাভাবিক, উল্টো আরো দাবি করেন যে একচেটিয়া বিষমকামিতা স্বাভাবিক এবং এটি সামাজিক বাধা ও সামাজিক শর্তাবলীর ফল।

আমেরিকান জার্নাল অফ পাবলিক হেলথ (American Journal of Public Health) ২০০৩ সালে আলফ্রেড কিনসির জীবনী আলোকপাত করেন " Alfred C. Kinsey: A Pioneer of Sex Reacher. " নামক প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়, আলফ্রেড কিনসি ১৯৩৮ সালে তার জীবনে একটি নতুন ধাপে পা রাখেন। বিয়ে ও পরিবার বিষয়ক একটি কোর্স পরিচালনা করেন। কিনসির যৌন উদ্দীপনার জীববিজ্ঞান, যৌন সম্পর্কের কৌশল এবং গর্ভনিরোধের পদ্ধতির ওপর চিত্রিত লেকচার গুলো এবং সামাজিক বিধির নিষেধের সমালোচনা ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। তিনি প্রথাগত যৌন আচরণের ধারণার পরিবর্তে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রস্তাব করেন যার মাধ্যমে অনেক যৌন কার্যক্রমকে স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিনসি মানব যৌন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত যৌন ইতিহাস সংগ্রহ করা শুরু করেন এবং ছুটির সময় গারি, শিকাগো, সেন্ট লুইস এবং ফিলাডেলফিয়ার মতো শহরগুলোতে একই ধরনের সাক্ষাৎকার নেন। ১৯৪৭ সালে তিনি রিসার্চ কাউন্সিল এবং রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ' ইনস্টিটিউট অফ সেক্স রিসার্চ ' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪৮ সালে কিনসি ও তার সহযোগীরা 'Sexual Behavior in the Human Male' এবং ' Sexual Behavior in the Human Female' নামক দুটি বই প্রকাশ করেন। ধর্মীয় নেতারা এবং স্কলাররা এই সমাজবিরোধী বই প্রকাশ করার জন্য তীব্র নিন্দা জানান।

জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের জনক

আমেরিকান শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ Doctor Miriam Grossman যৌনতা, লিঙ্গ পরিচয় এবং যুবক-যুবতীদের মানসিক স্বাস্থ্যের একজন সুপরিচিত গবেষক এবং লেখক । তিনি ২০০১ সালে " Lost in, Trans Nation : A Child Psychiatrist's Guide Out of the Madness ' নামক বই লিখেছেন যেখানে জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের জনক হিসেবে প্রফেসর জন মানি সম্পর্কে বলেন। প্রফেসর মিরিয়াম গ্রসম্যানের মতে, মেডিকেল ইতিহাসে

সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোর পিছনে ক্লিনিক্যাল মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জন মানির ভূমিকা রয়েছে। এই বিতর্কের একটি বিষয় ছিল Gender Identity Disorder সম্পর্কিত।

জন মানি থেকে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তার থিসিসের বিষয় ছিল হেরমাফ্রোডিটিজম। একটি বিরল মেডিকেল কন্ডিশন যেখানে নবজাতকের লিঙ্গ স্পষ্ট নয়। এই সমস্যা নিয়ে কাজ করার প্রবল আগ্রহ থেকেই জন মানি প্রথমবারের মতো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। যাতে তিনি উল্লেখ করেন হেরমাফ্রোডাইট শিশুরা ছেলে বা মেয়ে হিসেবে বড় হতে পারে।

সেই সময়ে জেন্ডার আইডেন্টি ডিসঅর্ডার বা লিঙ্গ অস্পষ্ট শিশুর বাবা মা কঠিন উভয়সংকটে থাকতেন এই ভেবে যে তাদের সন্তানকে কিভাবে পরিচয় দেওয়া হবে, কিভাবে বড় করা হবে। এসব প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে ছিল অজানা। জন মানি হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে হেরমাফ্রোডাইটদের জন্য প্রথম ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে তাদের অপারেশনের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হত। পরবর্তীতে এই ক্লিনিকে প্রাপ্তবয়স্কদেরও লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন করা হতো। এছাড়াও জন মানি দাবি করেন নারী-পুরুষের পরিচয়, আচার-আচরণ এবং আগ্রহগুলো মূলত সামাজিকভাবে গঠিত; এখানে ক্রোমোজোমের শারীরিক গঠনের কোন ভূমিকা নেই। তিনি লিঙ্গ নির্ধারণের স্বাভাবিক ধারণা XY হলে পুরুষ ও XX হলে নারী এ ধারণাটিকেই বদলে দেন। উপরন্তু দাবী তোলেন মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গের অস্তিত্বের কথা, যা শারীরিক লিঙ্গ থেকে আলাদা ।

এভাবে ১৯৫৭ সালে তিনি 'Gender Identity ' শব্দটি প্রবর্তন করেন, যা মুলত মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়কে বোঝায়। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশুরা জন্মের সময় লিঙ্গ নিরপেক্ষ থাকে এবং তাদের লিঙ্গ পরিচয় সামাজিক প্রভাবে তৈরি হয়। আরও দাবি করেন যে লিঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব এবং একটি শিশুকে বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে বড় করাও সম্ভব।

জন মানি মূলত আলফ্রেড কিনসির অনুসারী ছিলেন।তার জীবনের মিশন ছিল এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা যা তিনি কল্পনার চেয়েও সফলভাবে করেছিলেন। তিনি ছিলেন যৌন গবেষকদের একটি দলের সদস্য যাদের অনেকে আলফ্রেড কিনসির শিষ্য ছিলেন। কিনসি ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত যৌন গবেষক ছিলেন, যিনি প্রথাগত যৌন আচরণের বিরোধী ছিলেন।

জন মানি মনে করতেন অস্বাভাবিক যৌন আচরণ বলতে কিছু নেই। কোন আচরণ কে বিচার করা উচিত নয়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে SIECUS (Sexual Information and Education Council of the United States) এর উদ্যোগে, তারা চিকিৎসার জন্য যৌন শিক্ষায় "Sexual Attitude Reassessment " (SAR) প্রবর্তন করেছে।

ট্রান্সজেন্ডারের বাস্তব কিছু দৃষ্টান্ত

ব্রুস জেনার : আমেরিকান ক্রীড়াবিদ। তিনি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ১৯৭৬ সালের অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল জিতে নেন। খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি ব্যবসা এবং বিনোদনের ক্যারিয়ারে সফলতা লাভ করেন। তিনি তিনবার বিয়ে করেন এবং তার ছিল ৬ সন্তান। ৬৬ বছর বয়সে ২০১৫ সালে তিনি নিজেকে নারী হিসেবে ঘোষণা দেন। ব্রুস জেনার থেকে নাম পরিবর্তন করেন এবং হয়ে যান ক্যাটালিন জেনার।

ওয়াচস্কি ব্রাদার্স থেকে সিস্টার্স: ১৯৯৯ সালে সাড়া জাগানো সিনেমা ম্যাট্রিক্স এর পরিচালক ছিলেন দুই ভাই। ল্যারি এবং অ্যান্ডি ওয়াচস্কি । তারা নিজেদের নারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ওয়াচস্কি বোন হয়ে গেছেন!

মেলিসা পল্টন পুরুষ হিসেবে ২০১৯ সালের ইংল্যান্ডের স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি দিব্যি পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ২০২৩ সালে হঠাৎ নারী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। শুধু পোশাক পরিবর্তন এবং পরচুলা লাগিয়ে তিনি নারী হয়ে গেলেন। এই দৃষ্টিগত বিষয় নিয়ে বিরোধী দলীয় নারী এমপি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মন্তব্য করায় তাকে ট্রান্সফোবিক আখ্যা দেওয়া হয়। অবশেষে তিনি সেই পোস্ট মুছে দিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন।

অনেকের ধারণা ট্রানজেন্ডার হতে বাহ্যিক বা শারীরিক পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হল এসব পরিবর্তন ছাড়াও যে কেউ মনের ইচ্ছা অনুযায়ী শুধু সর্বনাম পরিবর্তন করেই ট্রান্সজেন্ডার বনে যেতে পারেন। এমনই দৃষ্টান্ত হয়েছেন বিখ্যাত নারীবাদী অধ্যাপক জুডিথ বাটলার বর্তমান ট্রান্সজেন্ডারবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক। তিনি একজন মহিলা এবং সমকামী (লেসবিয়ান)। তিনি শুধু সর্বনাম পরিবর্তন করে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দেন। ডিজনি চ্যানেলের টিনেজারদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানের বিশ্ব বিখ্যাত কিশোরী অভিনেত্রী মিলি সাইরাস প্যানসেক্সুয়াল ও জেন্ডার ফ্লুইড আইডেন্টিটি গ্রহণ করেছেন কোন পরিবর্তন ছাড়াই।

মার্কিন টিভি উপস্থাপক ড. ফিলের উপস্থাপনায় একটি টিভি লাইভ শোতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় গ্যারি নামের জনৈক বাবা নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি তার ছেলেকে সেখানে প্রথমবারের মতো একজন নারী হিসেবে দেখতে পান। ইন্টারভিউয়ে গ্যারি

বলেন, "আমি শুধু ক্ষতিই অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি। ...ওকে মেয়ে হিসেবে কীভাবে গ্রহণ করব বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে।" ড. ফিল প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি এটা আপনার দোষ? জবাবে গ্যারি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি এটা আমারই দোষ।" এরপর ড. ফিল ইনসাইড ইডিশনকে বলছিলেন, তিনি বিষয়টি উদ্যাপন করছিলেন না। তার কাছে বিষয়টি ছিল এ রকম যে, মানুষ হিসেবে আমি ব্যর্থ। বাবা হিসেবে আমি ব্যর্থ। আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। উল্লেখ্য, গ্যারির ট্রান্স মেয়ের নাম স্টেফ (Steph)। যে পূর্বে ছেলে ছিল এবং তার নাম ছিল জ্যাক (Zach)। সে একজন বিবাহিত ও মার্কিন সেনা এমপি ছিল। —ইনসাইড এডিশন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নিউইয়র্ক পোস্টে প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল, ‘নিউজার্সি কারাগারে দুই সহবন্দীকে গর্ভবতী করলেন ডেমি মাইনর নামের এক ট্রান্স নারী’ বিস্তারিত সংবাদে বলা হয়েছে, খুনের দায়ে ৩০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ২৭ বছর বয়সী ডেমি মাইনর (Demi Minor) নামের এক ট্রান্স নারীকে মহিলা কারাগারে রাখার পর তার দ্বারা সেখানে দুইজন নারী সহবন্দী গর্ভবতী হওয়ার ঘটনায় কারা কর্তৃপক্ষ তাকে বার্লিংটন কাউন্টিতে অবস্থিত তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের একটি কারাগারে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন। যেখানে সে একমাত্র নারী হিসেবে আছে। —নিউইয়র্ক পোস্ট, ১৭ জুলাই ২০২২।

যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত দেশ স্কটল্যান্ডে পুরুষ থাকাকালে দুজন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে একজন ট্রান্স নারীকে গ্রেপ্তারের পর তাকে নারী কারাগারে পাঠানো হয়। এ নিয়ে সেদেশে তোলপাড় শুরু হয়। —ফক্স নিউজ, ২৫ জানুয়ারি ২০২৩

সম্প্রতি জাপানের কিয়োটোর অধিবাসী জ্যাকি (Jackie) একটি অ্যামেবা প্রাইম (AMEBA Prime) রিয়েলিটি শোতে তার গল্প শেয়ার করার সময় নিজেকে ২৮ বছরের ট্রান্স-এজ দাবি করেছেন। যার মূল বয়স ৩৯ বছর, জন্ম ৫ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে। —মাস্ট শেয়ার নিউজ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

মেলোডি ওয়াইজহার্ট (Melody Wiseheart) নামের ৫০ বছর বয়সী একজন পুরুষ নিজেকে ট্রান্স-এজ ও ট্রান্স নারী দাবি করে ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৯ জন তরুণীর সাথে কানাডার একটি আঞ্চলিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। —দ্য ওয়েস্টার্ন জার্নাল, ২৭ অক্টোবর ২০২৩; বেরেল নিউজ, ২৪ অক্টোবর ২০২৩।

জার্মানির বার্লিন পটসামের প্লাটজ রেলপথ স্টেশনে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রায় ১০০০ মানুষ জড়ো হয়েছিল। যারা নিজেদেরকে 'কুকুর' হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে এবং তারা সেখানে একে অপরের সাথে চিৎকার বা ঘেউ ঘেউ করে যোগাযোগ করছিল। —নিউ ইয়র্ক পোস্ট, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩; ডেইলি মেইল, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

ফক্স নিউজ-এর শিরোনাম 'ট্রান্সজেন্ডার থেকে ট্রান্সঅ্যাবলড : মানুষ এখন নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত হওয়াকে বেছে নিচ্ছে। মূল সংবাদে বলা হয়েছে, বর্তমানে ট্রান্সঅ্যাবলবাদ নামে একটি ঝামেলাপূর্ণ সামাজিক সমস্যা উদ্বেগ তৈরি করছে।
ট্রান্সঅ্যাবলবাদ হল BIID বা বডি ইন্টিগ্রিটি আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার-এর জন্য ব্যবহৃত একটি নতুন পরিভাষা। যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচয় দেয়। —ফক্স নিউজ, ২৮ এপ্রিল ২০২৩

বাংলাদেশের কিছু উদাহরণ

ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে অন্যতম হোচিনমিন ইসলাম। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠায় আইন তৈরির দাবিও জানিয়ে আসছেন তিনি। তিনি বলেন, 'আমার শরীরটা পুরুষের ছিল, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে নারী ভাবতাম। অবশেষে অস্ত্রোপচার করে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই। এখন আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন নারী।'
হো চিন মিন ইসলামের কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ট্রান্সজেন্ডারবাদের সঙ্গে শারীরিক সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন করেছেন ২০২৩ সালে। কিন্তু এর তিন বছর আগে থেকেই সামাজিক ও আইনিভাবে তাকে এবং তার মতো অন্যদের নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবি করে আসছেন তিনি। অর্থাৎ অস্ত্রোপচার হোক বা না হোক, যখন থেকে কেউ নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করা শুরু করবে, তখন থেকেই সামাজিক ও আইনিভাবে এ দাবি মেনে নিতে হবে। ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট বাংলাদেশের আলোচিত এই ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট হোচিমিন ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর সাথে গণভবনে সাক্ষাতও করেছে। এমনকি ট্রান্সজেন্ডার বিষয়টি সংসদেও পৌঁছে গেছে। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন পাস হচ্ছে বলে খবর বেরিয়েছে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে।

গত ৫ জানুয়ারি ২০২৪, কলারোয়া নিউজ-এর প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম—'কলারোয়ায় দুই কিশোরীর সমকামী প্রেম, বিয়ে করতে অনড়, অবশেষে আটক।' মূল সংবাদ থেকে জানা

যায়, এক বিবাহিত বান্ধবীর প্রেমের টানে সাতক্ষীরার কলারোয়ার এক কিশোরীর কাছে ছুটে আসে সুনামগঞ্জের এক কিশোরী।

২৮ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক সমকালে, প্রকাশিত সংবাদে আশুলিয়ার রাকিব হাসান হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও পিবিআই ঢাকা জেলার এসআই আনোয়ার হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারের পর চম্পা ওরফে স্বপ্না জানিয়েছেন, তিনি একজন স্বাভাবিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নওশাদ। তাঁর ১২ বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিষণ্নতায় ভুগতে থাকেন এবং কর্মবিমুখ হয়ে বেকার জীবনযাপন করেন। ওইসময় দেলু হিজড়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দেলু প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক পুরুষ। হিজড়া সেজে নানা অপকর্ম করেন। তিনি নওশাদকে হিজড়া হওয়ার প্রস্তাব দেন। দেলু জানান, হিজড়া হলে তিনি সহজে অনেক টাকা আয় করতে পারবেন। সেই সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তিতে দিনযাপন করতে পারবেন। তাঁর কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নওশাদ হিজড়াদের দলে যোগ দেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলো থেকে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম, ‘নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে’ বিস্তারিত সংবাদে বলা হয়েছে, শারমিন আক্তার ঝিনুক ওরফে ঝিনুক সওদাগর নামের মেয়েটির বর্তমান নাম জিবরান সওদাগর। শুধু নাম পরিবর্তন নয়, অস্ত্রোপচার করে ৩০ বছর বয়সী ঝিনুক এখন একজন পুরুষ। নারী-পুরুষের ফেরে রেলওয়ের চাকরিতে যোগ দিতে পারছেন না তিনি। এক নারীকে ভালোবাসলেও তিনি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে সংসারি হয়েছেন।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারের কারণ ও প্রভাবক সমূহ

একজন মানুষ নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের হিসেবে দাবি করার মুল কারণ দুটি ; মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃত মানসিকতা। এছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক প্রভাব ও ধর্মীয় মুল্যবোধের অভাবসহ অন্যান্য অন্যতম কারনগুলো তুলে ধরা হলো:

১.মানসিক অসুস্থতা :

ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত মানসিক অসুস্থতা ও যৌন বিকৃতির ফলাফল। কিছু মানুষ এক ধরনের মানসিক রোগে ভোগে যে তাদের মনে হয় তারা ভুল দেহে আটকা পড়েছে। এ ধরনের মানুষ একটা বয়সে গিয়ে নিজের শরীর এবং আচরণ নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। তারা মনে

করতে শুরু করে যে তাদের শরীর যদি বিপরীত লিঙ্গের মতো হতো, তারা এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেত। এধরনের রোগকে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার (Gender Identity Disorder) বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে এটি জেন্ডার ডিসফোরিয়া(Gender Dysphoria) নামে বেশি পরিচিত। এটি মূলত মানসিক সমস্যা। যাদের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা দেখা যায়, তাদের মধ্যে ডিপ্রেশনসহ অন্যান্য আরো অনেক জটিল মানসিক সমস্যা থাকে।আবার অনেক সময় এই ধরনের মানুষ অনেকেই শৈশবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে ফলে তাদের মনের ভেতর এ ধরনের চিন্তার উদ্ভব হয়।

২.যৌন বিকৃতি :

নিজেদের নারী দাবি করা পুরুষদের একটা বড় অংশ এই কাজটা করে নিজেদের যৌন আনন্দের জন্য। এই পুরুষরা নিজেকে নারী হিসেবে চিন্তা করে, নারীর পোশাক পরে, নিজেদের নারী হিসেবে উপস্থাপন করে যৌন আনন্দ লাভ করে। এটা এক ধরনের যৌন বিকৃতি যাকে বলে অটোগাইনেফিলিয়া(Auto-Gynephillia)। অটোগাইনেফিলিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। কেউ হয়তো খোলামেলা পোশাকের নারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চায়। কেউ হয়তো নারী সুলোভ আচরণে থাকতে চায়, আবার কেউ হয়তো যৌনকর্ম করতে চায় নারী হিসেবে। অটোগাইনেফেলিয়া থাকা পুরুষদের সবাই সমকামী হয় না। এদের একটা বড় অংশ নারীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। তাদের বলা হয় অটোগাইনেফাইল। তারা এমন পুরুষ যারা নারী দেহ ভালোবাসে এবং সে তার দেহকে নারী দেহে পরিণত করতে চায়। এটা মূলত এক ধরনের ফ্যান্টাসি এবং বিকৃত মানসিকতার ফল।

৩. সামাজিক প্রভাব:

নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করা মানুষের সংখ্যা বাড়ার অন্যতম কারণ হলো পশ্চিমা সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, হলুদ মিডিয়া এবং তাদের পারিপার্শ্বিকতা। বর্তমান সময়ে পশ্চিমা বিশ্বের আম-জনতার মাঝে এর ছবক দেওয়া শুরু হয়েছে স্কুল থেকেই। আধুনিক পৃথিবীতে পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি চারপাশে। প্রাইমারি স্কুল থেকে শিশুদের শেখানো হচ্ছে আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে। ট্রানজেন্ডারবাদের অবস্থান মিডিয়াতে বলা হচ্ছে, ট্রান্সজেন্ডার খারাপ কিছু নয় বরং তারা বিশেষ ধরনের মানুষ। সমাজে তাদের আলাদা দাম আছে। তাদের কৃতিত্ব তুলে ধরা হচ্ছে বড় করে। যার ফলে রীতিমত মগজ ধোলাই করা হচ্ছে তাদের। সবমিলিয়ে সামাজিক নানা কুপ্রভাবে কিছু

বিকৃতমনা মানুষ নিজেকে ভাসিয়ে দেয় এক বিভ্রান্তির স্রোতে। নিজেকে দাবি করে বসে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে।

৪. এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতা :

বিশ্বব্যাপী ট্যান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও এনজিও। বাংলাদেশের এলজিবিটি ও ট্রান্সজেন্ডার এজেন্ডার নেপথ্যে রয়েছে কয়েকটি নামকরা এনজিও। সমকামীতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর অর্থায়নে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় এনজিওরা। তাদেরকে সহযোগিতা করছে আমেরিকান বিলিয়নার ও সমকামী জন স্ট্রাইকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরকাস ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশে এরকম কয়েকটি এনজিও হলো :

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি :

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও সমকামীদের নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিও হলো বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বর্তমানে সংস্থাটি বাংলাদেশের ৩০ টিরও বেশি জেলায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমদিকে সমকামী পুরুষদের নিয়ে কাজ করলেও গত ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে প্রচুর কার্যক্রম করছে সংস্থাটি। শক্তিশালী মিডিয়া এডভোকেসির মাধ্যমে তারা নাটক, কমিউনিটি রেডিও, শর্ট ফিল্ম, গণস্বাক্ষর অভিযান ও অন্যান্য মিডিয়াতে জেন্ডার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে।

ব্রাক এনজিও :

বাংলাদেশ বিকৃত যৌনতার প্রশ্নকে অধিকারের আলাপ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ব্রাক। বিশেষ করে সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস প্রি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো। মিডিয়া, একাডেমিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডা সমর্থনে কিছু মানুষ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত লোকেরা অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাকটিভিজম সংক্রান্ত জরুরী প্রশিক্ষণ পায় ব্র্যাকের ওয়ার্কশপ গুলোতে। ব্র্যাক এলজিবিটির ব্যাপারে ইতিবাচক খবর প্রচারের জন্য সাংবাদিকদের পুরস্কারের ব্যবস্থাও করেছিল।

বয়েজ অব বাংলাদেশ :

বয়েজ অফ বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এলজিবিটির প্রতীক রংধনু পতাকা টানিয়ে অনুষ্ঠান করে। বিকৃত যৌনতা বৈধতা আদায়ের জন্য একটি কোয়ালিশন গঠন করে এবং বাংলাদেশের দন্ডবিধি ৩৭৭ ধারা বাতিলের দাবি উত্থাপন করে। বাংলাদেশের সমকামীরা যেন সহজে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতে পারে তার জন্য সমকামীদের আন্তর্জাতিক ডেটিং অ্যাপের সাথে কোলাবরেশন করে, সমকামীদের আইনি ক্ষমতায়ন নিয়ে তারা কাজ করে। সমকামিতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণের লক্ষে পাঁচ বছরের একটি পরিকল্পনাও তারা প্রস্তুত করেছে। বর্তমানে ট্রানজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে খ্যাতি পাওয়া অনেকেই বয়েজ অফ বাংলাদেশের সদস্য।

৫. পাঠ্যপুস্তক :

সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প'-এ সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদকে স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা করা হয়।

৫১ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরিফা বলছে,

"আমার শরীরটা ছেলেদের মত হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে.... "

এ গল্পে শরিফা নিজেই স্বীকার করেছে, সে ছোটবেলায় ছেলে ছিল কিন্তু যখন আস্তে আস্তে বড় হল তখন সেই শরীফ আহমেদেরই নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করল এবং মেয়েদের মত আচরণ করতে লাগলো। আর এভাবেই তার ভালো লাগে।

৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরিফা কে একজন বলছে,

"আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার।"

৫৩ পৃষ্ঠায় পাঁচজন শিক্ষার্থীর কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এক শিক্ষার্থী বলছে তার মা তাকে শিখিয়েছে, "ছোটদের কোন ছেলে মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে। "

মূলত নারী পুরুষের আলাদা লিঙ্গ পরিচয় এর ধারণাকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর বইটির এই অধ্যায়ে। কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা। ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের যে বিষয়গুলো পশ্চিমা স্কুলগুলোতে শেখানো হচ্ছে সেগুলো এখন শেখানো শুরু হচ্ছে আমাদের সন্তানদেরকেও। আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের। শিশুরা সহজে প্রভাবিত হয়। নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজে আগ্রহ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শিশু-কিশোরদের সামনে

বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী গণমানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে তুলে ধরার দুঃসাহসিকতাও সহজেই বোধগম্য। শিশুদের মনে যেকোনো কিছুই সহজে গেঁথে যায়। শিশু বয়সেই যদি বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও এর সূত্র ধরে পরবর্তীতে সমকামিতাকেও তুলে ধরা হয় তাহলে তারা ট্রান্সজেন্ডারবাদ, সমকামিতা ও এলজিবিটিকিউকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেবে।

৬. মিডিয়া ও অ্যাক্টিভিস্টদের প্রচারণা :

বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে পুরোদমে কাজ করছে মিডিয়া ও অ্যাক্টিভিস্টরা। ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে ইতিবাচক ভাবে নানা ধরনের প্রতিবেদন নিয়মিত হয়ে আসছে ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে। বিশেষ করে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও সমকাল পত্রিকা, ৭১ টিভি, বৈশাখী টেলিভিশন, সময় টেলিভিশন, গুগল ও ইউটিউবে ট্রান্সজেন্ডারবাদ সম্পর্কিত প্রচুর নিউজ ও কনটেন্ট রয়েছে। নিউজ মিডিয়ার পাশাপাশি বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনের টকশোতে উপস্থাপন করা হচ্ছে নারী সাজা পুরুষদের। সুস্থ দেহে মানুষ অপারেশন করে লিঙ্গ পরিবর্তন করছে এমন ঘটনাকে দেখানো হচ্ছে নির্দোষ ও ইতিবাচকভাবে। নারী সাজা পুরুষদের রীতিমতো মডেল বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল করেছেন সঞ্জীবনী সুধা। এমবিএ করেছেন অঙ্কিতা ইসলাম। ইয়াসিন আহমেদ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার আপ পায়। নাটকের ট্রান্সজেন্ডার নারী নুসরাত মৌ। এভাবেই ট্রান্সজেন্ডারদেরকে হিরো বানিয়েছে কিছু হলুদ মিডিয়া। দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশব্যাপী ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করছে ত্রিশটিরও বেশি কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার খুবই নগণ্য। কিন্তু অল্প কিছু মানুষকে এই কৌশলে বারবার মিডিয়াতে আনা হচ্ছে যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো যায়। এমনকি খবর প্রচার ও প্রসারের জন্য সাংবাদিকদের বিশেষভাবে 'মিডিয়া ফেলোশিপ 'পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক এর ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের শিক্ষা, এমনকি মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণাসহ প্রতিটি পদক্ষেপ এর পেছনে রয়েছে এলজিবিটি সংগঠন, এনজিও এবং তাদের পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকগণ ও অ্যাক্টিভিস্টস।

৭. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ :

বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারের অন্যতম কারণ হলো পাশ্চাত্য ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। যারা এদেশে এলজিবিটি ও সমকামিতার ফেরিওয়ালা তাদের প্রোফাইল খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তারা পশ্চিমা বিশ্বের বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুসারী। পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এদেশে এলজিবিটি প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ জাতিগতভাবে বাংলাদেশের মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সেই নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পদদলিত করে আমরা কোন বিজাতীয় সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারি না। বিশেষ করে কোন মুসলমান এমনটি ভাবতেও পারে না। এ ব্যাপারে রাসূল(সা:) কঠোর নিষেধাজ্ঞা করেছেন।

তিনি বলেছেন, "তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর্ম কর"। (সহীহ মুসলিম, ৪৭৮)

তিনি আরও বলেছেন, " যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখল, সে ওই সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে গণ্য হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪০৩১)

সুতরাং বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রাসুল সাঃ এর হুঁশিয়ারির পরও যারা তা অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন উভয়ই ধ্বংস।

৮. ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব :

যারা ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলে আল্লাহর দেওয়া লিঙ্গকে পরিবর্তন করে থাকে, তাদের কারোরই ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই। তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করছে এবং তা আল্লাহদ্রোহীতার শামিল। অথচ একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে যাবতীয় অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মানসিক বিকারগ্রস্থতা থেকে বিরত রাখতে। একজন মুসলিমের কোনো ভাবেই উচিৎ নয় ট্রান্সজেন্ডারবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া।

৯. পারিবারিক বৈষম্য :

আমাদের সমাজে অনেক পিতা-মাতা রয়েছেন যারা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশু কিশোর কিংবা শৈশব থেকেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট সন্তান অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে পতিত সন্তানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ এমন সন্তানদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেন ও ত্যাজ্য ঘোষণা করে থাকেন। অথচ পরিবারের উচিত ছিল এমন সন্তানকে দোষী সাব্যস্ত না করে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। প্রয়োজনের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া। পারিবারিক অবহেলা, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে এক পর্যায়ে তারা এলজিবিটি কমিউনিটিতে যোগ দিয়ে লিঙ্গ

পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। আর এভাবেই আমাদের সমাজে ট্রান্সজেন্ডারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.তৃতীয় লিঙ্গের ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা

তৃতীয় লিঙ্গ হিজড়ার ব্যাপারে আমাদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। এরা ভাগ্য বিড়ম্বিত এক শ্রেণি হয়ে উঠছে। তাদের বাবা, মা, ভাই-বোন থেকেও যেন নেই। আমাদের সমাজ এদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে, দূর দূর, ছি ছি করা ব্যতীত আমরা এদের কিছুই দিতে পারি না। রাষ্ট্রও তাদের যথাযথ পুনর্বাসন দিতে পারেনি। ফলে তাদের চাঁদাবাজির কারণে সকলে অতিষ্ঠ। কিন্তু এর আড়ালে যে ভিন্ন অন্ধকার আরেক জগৎ রয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা কজনেই খবর রাখি?

মোটকথা, তৃতীয় লিঙ্গরা আমাদের সমাজেরই একটি অবহেলিত অংশ। তাই তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য কোটা রাখা, তাদের পুনর্বাসন করা জরুরি। এতে কারও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এর সাথে কথিত ট্রান্সজেন্ডারদের একীভূত করা হলে তা হবে চরম ঘৃণিত নোংরা একটি মতবাদকে প্রমোট করা। যা কোনোভাবেই কারো কাম্য নয়।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন

বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের সূচনা দেড়শ বছর আগের বার্লিনের উলরিখসের প্রজ্জ্বলিত সমকামী অধিকার আন্দোলন বাংলাদেশে পৌঁছায় ব্রাকের নেতৃত্বে ২০০৫ সালে। বাংলাদেশে ব্র্যাক এনজিও সমকামিতা অধিকার নিয়ে একাডেমিক গবেষণা শুরু করে বৃটেনের অর্থায়নে। এরই প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে জুলাই মাসে প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার ডেকে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ স্কুল জনপরিসরে সমকামী অধিকার দাবি করে। এরপর উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও ব্র্যাকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের শুরু হয় সমকামী আন্দোলনের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় ব্র্যাক এনজিও ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন পাস করানোর পর্যায়ে উপনীত হয়।

ট্রান্সজেন্ডারের পৃষ্ঠপোষক ব্র্যাক ও এর সহযোগী

নারী অধিকারের মোড়কে সমকামী অধিকার আন্দোলন জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মূল ধারায় আসে। বাংলাদেশে সমকামী অধিকার আন্দোলনের কার্যক্রম

শুরু হয়েছে ১৯৯৫ সালের ব্র্যাকের যৌন শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে। যদিও তখন সমকামিতা ইস্যু গ্লোবাল এজেন্ডা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেই মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সমকামী অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্র্যাক দেশের এনজিও, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে এক ছাদের নিচে আনতে সক্ষম হয়।

সমকামী আন্দোলনের প্রধান কার্যালয় হল ব্র্যাকের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে। এর সফলতার মূলে রয়েছে সামাজিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এবং এগুলোর তথ্য উপাদ্যের ওপর নির্ভর করে প্রকল্প প্রণয়ন এবং সেগুলোর মূল্যায়ন করার সক্ষমতা। দেশের নীতি নির্ধারক এবং গণমাধ্যমের সাথে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক যেকোনো বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর সুবিধা হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত। তাই কোন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা কাদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হয়, যদি সরকারি বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারে। একটা বিষয় খেয়াল করলে দেখা যায়, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা এবং বড় কর্মকর্তা বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত তাদের কনসালটেন্ট হিসেবে রিক্রুট করতে বিদেশি সংস্থা গুলোর বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতা এবং গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক গুলো নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজে লাগানো। উন্নয়নশীল দেশে পশ্চিমা ফান্ডে এনজিও গুলো সরকারি সহযোগিতা হিসেবে কাজ শুরু করে। এরপর আস্তে আস্তে তাদের মূল্যবোধ সংক্রান্ত এজেন্ডা গুলো চুপিসারে বাস্তবায়ন করে। সময়ের পরিক্রমায় দুর্বল রাজনৈতিক কালচারের সুযোগে এনজিও গুলো এ দেশ ও সমাজের স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায় এবং তারা নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

LGBTQ অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে একটি বিজনেস মডেল হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। মানুষের ব্যবহার্য পণ্য বা সার্ভিস নিয়ে বিজনেস উদ্যোগের চেয়ে বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে পায়ু সঙ্গমের মতো যৌন আচরণকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করাও দুঃসাহসিক কাজ। বাস্তবায়ন তো পরের কথা। এখানে ৯০ পার্সেন্ট মুসলিম যারা কওমে লুতের ইসুকে ঘৃণিত হিসেবে জানে। কমিউনিটি পর্যায়ে ইসলামিক স্কলারদের প্রতি সাধারণ মানুষ আস্থাশীল যা বিভিন্ন জরিপে উঠে এসেছে। দেশের সমকামীতা অপরাধ আইনও বলবত রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা রাষ্ট্রের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সহায়তায় এবং তাদের অর্থায়নে ব্র্যাক বাংলাদেশের সমাজের মূল্যবোধ এবং আইনবিরোধী এই চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প গ্রহণ করে।

২০০৪ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী পাবলিক হেলথ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জায়নবাদী রকফেলার ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফ, গেটস ফাউন্ডেশন, জেমস পি গ্রান্ট ট্রাস্ট এবং ব্র্যাকের নিজস্ব ফান্ডিং এর সহায়তায় স্কুলটি যাত্রা শুরু করে। আলফ্রেড কিনসি নেতৃত্ব আমেরিকার যৌন বিপ্লব ঘটাতে বিশাল অর্থায়ন করেছিল এই রকফেলার ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায়। ২০০৮ সালে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদকে রকফেলার ফাউন্ডেশন "রকফেলার লিডারশিপ" পুরস্কারে ভূষিত করে এবং ২০১১ সালে এই সংস্থা ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুলে "সেন্টার ফর ইউনিভার্সাল কভারেজ অব হেলথ" নামে একটি সেন্টার রীতিতে অর্থায়ন করে। ২০১৩ সালে "Rebound : Building a more Rasilient World by the Rockefeller Foundation " শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে ব্র্যাক কর্মকান্ডকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। ব্র্যাকের ভালো বন্ধু হিসেবে পরিচিত ইউনিসেফ এর সাবেক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের নামে স্কুলটির নামকরণ করা হয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের বার্ষিক প্রতিবেদন গুলোতে রয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু হয়েছিল সাদামাটা ভাবে।

বিশ্বের স্বনামধন্য পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার টপ ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পরামর্শ টিম গঠন করা হয়। যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে ২০০৫ সালে ব্র্যাকের সাভার ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ হয়, সেখানে বিভিন্ন এনজিও ব্রাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পপুলেশন কাউন্সিল, উন্নয়ন সহযোগী পার্টনার, ডিএফআইডি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইউনিসেফ, এবং সরকারি ডিজি হেলথ এর প্রতিনিধিসহ আরও কিছু সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

২০০৭ সালে,ব্র্যাক জনপরিসরে সমকামী অধিকার দাবি করার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর তথ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে এখন পর্যন্ত ১৫০ টি সংস্থা অর্থায়ন করেছেন। তারা বর্তমানে এটি ১২৫ টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা সংস্থা এবং ৭৫টি দেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে একসাথে কাজ করছে। তন্মধ্যে বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান পার্টনার হিসেবে জড়িত রয়েছে।

আইসিডিডিআরবি: ব্র্যাকের পার্টনার

ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত "ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল রিসার্চ বাংলাদেশ"। এটার নাম আইসিডিডিআরবি হলেও জনগণ এটিকে চেনে কলেড়া হাসপাতাল হিসেবে। অনেকেই সেন্টারটিকে বাংলাদেশের রিসার্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানলেও এটি বাংলাদেশের নয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক এনজিও প্রতিষ্ঠান। এই বিদেশি এনজিও বিশেষ প্রতিষ্ঠানের

মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে কিন্তু এটি সমাজ ও আইনবিরোধী LGBTQ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৭ সাল থেকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি :

যেটি ব্র্যাকের অন্যতম সহযোগী এনজিও। ভারতের অশোকা ফাউন্ডেশন এর সাইট প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ভারতীয় বংশদ্ভুত শিবানন্দ খান ১৯৯৬ সালে LGBTQ নেটওয়ার্ক করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। শিবানন্দ খান ব্রিটেনে পড়াশোনা করার সময় সমকামী এক্টিভিস্ট হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া সমকামী নারী ও পুরুষদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'শক্তি' নামক সংগঠন। ৯০ এর দশকের শুরুর দিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এলজিবিটিকিউ নেটওয়ার্ক তৈরিতে দৌড়ঝাপ শুরু করেন। তৈরি করেন " নায ফাউন্ডেশন" নামক এনজিও। শিবানন্দ খান এর মেন্টরশীপে এবং উৎসাহে সমকামী পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেকে সামনে রেখে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ১৯৯৭ সালে এনজিও নিবন্ধন করে। সমকামীদের জন্য নিরাপদ জায়গা তৈরি এবং সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিডিডিআরবি এর সহযোগী বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পশ্চিমা এলজিবিটিকিউ বাস্তবায়নে দেশে পশ্চিমা এজেন্ডার তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৭ সাল থেকে জেমস পি গ্রান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল এর নেতৃত্বে বন্ধু সোশ্যাল সুগঠিত হয়ে মূল ধারায় সমকামী অধিকার নিয়ে অ্যাডভোকেসি শুরু করে।

বাংলাদেশের সমকামী অধিকার আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস :

বাংলাদেশের সমকামী অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস কে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়।

প্রথম ধাপ : যৌন স্বাস্থ্যসেবা এবং সত্যতা। (১৯৯৬ থেকে ২০০৬)

দ্বিতীয় ধাপ : জনপরিসরের সমকামী অধিকার দাবি এবং নেটওয়ার্ক তৈরি (২০০৭ থেকে ২০১৩)

তৃতীয় ধাপ : প্রকাশ্যে সমকামিতা অ্যাক্টিভিজম (২০১৫ থেকে বর্তমানে চলমান)

চতুর্থ ধাপ : পলিসিতে তথা পাঠ্যপুস্তক, জনশুমারি, যৌনশিক্ষা আইনে প্রভাব বিস্তার (২০২০ থেকে ২০২৩)

ব্র্যাক আইসিডিডিআরবি এবং বন্ধু সোশ্যাল থেকে প্রকাশিত জার্নাল পেপার, মনোগ্রাম, রিভিউ পেপার এবং ওয়ার্কসপে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে LGBTQ শব্দগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলো হল :

- পুরুষ-পুরুষে যৌনতায় লিপ্ততা।
- মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয় বা জেন্ডার আইডেন্টিটি : এটা নারী পুরুষ ছাড়াও আরো ১০০ প্লাস হতে পারে।
- যৌন এবং প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার, যৌনরুচি, যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা।
- যৌন বৈচিত্র্যতা।
- যৌনস্বাস্থ্য ও যৌন সংখ্যালঘু।
- বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।
- যৌন অধিকার, লিঙ্গবৈষম্য, লিঙ্গ সমতা ও সমতন্ত্র।

পশ্চিমাদের ভয়াল থাবা : LGBTQ এর বিস্তার

LGBTQ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমকামিতাকে বৈধ করার একটি আপডেট মতবাদ। তাদের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ১৮টি দেশে সমকামিতাকে রাষ্ট্রীয় ভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একজন পুরুষ পুরুষকে এবং একজন নারী অন্য নারীকে বিয়ে করারকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের ১৬০টি দেশে ১৭০০ সংস্থা এই ঘৃণ্য মতবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনকুবেররা এর পিছনের কোটি কোটি টাকা খরচ করছে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদটি হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া বন্যার মতো কোনো আপদকালীন সমস্যা নয়।সমকামিতাকে স্বাভাবিক করতে আন্তর্জাতিক মিশনের অন্যতম একটি প্রজেক্ট হলো ট্রান্সজেন্ডারবাদ । এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টিকারী একটি মানসিক ব্যাধি । ভয়াবহ এ ফিতনা নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই। লজ্জা ও সংকোচ প্রকাশের আর সময় নেই। পশ্চিমা বিশ্বের এই আবর্জনা এখন আমাদের দেশে শক্ত ভিত্তি গড়ার বন্দোবস্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলার পথে।

আমরা হয়তো ভাবতে পারি এটি বহির্বিশ্বের কোন সমস্যা। কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি পশ্চিমাদের শকুনরুপী অশুভ থাবা। যা ইতিমধ্যে বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশে সামাজিকভাবে ট্রান্স মতবাদ স্বাভাবিকরণ এবং আইনত সুরক্ষা আদায়ে এরা ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রায় সকল প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রথমতঃ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন কনটেন্টে, চোখ দিয়ে পানি আসার মতো গল্প তৈরী করে হিজড়া ও ট্রান্স তালগোল পাকিয়ে মানুষের সহানুভূতি আদায় করছে। যেখানে

দেখানো হচ্ছে ট্রান্সরা অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অতঃপর মেইনস্ট্রিম মিডিয়া ব্যবহার করে সমাজের চোখে তাদেরকে সাহসী চরিত্র এবং হিরো হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ার কিছু সংবাদ শিরোনামে চোখ বোলালেই বিষয়টা বুঝা যায়। যেমন- 'রূপান্তরিত এক নারীর বদলে যাওয়ার গল্প'। 'ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ পাঠক তাসনুভার বদলে যাওয়ার গল্প'। 'ট্রান্সজেন্ডার নারী ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে ইতিহাস গড়ার অণ্বেষায়'। '১০০ বছরের ইতিহাসে ঢাবিতে ১ম ভর্তি হলো ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থী'।, 'টিএসসি'তে পালিত হলো 'ট্রান্সজেন্ডার স্মরণ দিবস'।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাউল হলে সজীব নামে একজন বড় ভাই ছিলেন। মেয়েদের মতো চাল-চলনের জন্য ছেলেরা প্রায়শ তার সাথে দুষ্টুমি করত। কিছুদিন আগে মিডিয়া কভারেজে প্রচারিত হলো, 'সজীব থেকে সঞ্জীবনী; সঞ্জীবনী সুম্বা, খুলে দিতে চান সমাজের রুদ্ধ দুয়ার'। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ বাস্তবায়নের ২য় ধাপে বর্তমানে বিভিন্ন গোল টেবিলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ট্রান্সদের অধিকার সুরক্ষার আওয়াজ তোলা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক NCTB সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামে বিকৃত যৌনতা এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই দুই ধাপের পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়াও এগিয়েছে সমানতালে।

আমরা জানি, কোন প্রস্তাবনা আইনে পরিণত হতে হলে মোট ৪টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়।- ১. আইনের খসড়া তৈরী।

২. খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

৩. মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন চূড়ান্তকরণ।

৪. সংসদে উত্থাপন এবং পাশ হওয়া।

বাংলাদেশ বর্তমানে 'ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন'-এর তৃতীয় ধাপে অবস্থান করছে। গত ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা' এই শিরোনামে প্রকাশিত রির্পোটে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০২৩' শীর্ষক আইনটি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাশ করা হবে বলে জানিয়েছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব খায়রুল আলম শেখ।

উল্লেখ্য, গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২৩ 'ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন ২০২৩'-এর খসড়া উপস্থাপন করা হয়।এর অর্থ হলো আগামী নতুন জাতীয় সংসদে এ জঘন্য আইনটি পাশ হওয়া কেবল সময়সাপেক্ষ। যদিও স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে দেশী-বিদেশী একটি চক্র সরকারকে ভুল বুঝিয়ে আইন পাশ করাতে চাচ্ছে। হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দগত পার্থক্য না বুঝার কারণে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন ২০১৮ সালে পাকিস্তান সংসদে ট্রান্সজেন্ডার বিল পাশ হয় এবং পরবর্তীতে ১৭ই মে ২০২৩ তারিখে আইনটি বাতিল ঘোষণা

করা হয়। মূলতঃ আমরা যে কারণে হিজড়াদের অধিকার আদায়ে কথা বলব, ঠিক একই কারণে ট্রান্সদের বিপক্ষে থাকব।

অনেকে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বলে থাকেন, এটা ভুল। আল্লাহ তা'আলা লিঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, পুরুষ ও নারী। শুধু মানুষ নয় সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، 'শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী' *(লায়ল ৯২/৩)*। সুতরাং হিজড়া মানে তৃতীয় লিঙ্গ নয় বরং হিজড়া মানে লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। মানুষের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধী হয়, তেমনি লিঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী হয়। তাই হিজড়ারাও আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীবের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভিন্ন চোখে দেখার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে আমাদের অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একবার কোন গোত্রের নবজাতকের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যার নারী-পুরুষ চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার প্রস্রাবের রাস্তাকে কেন্দ্র করে তার মীরাছ প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ণিত হবে'। নারী-পুরুষ স্পষ্ট নয় এমন নবজাতকের মীরাছের ব্যাপারে আলী (রাঃ)ও একই উত্তর দিয়েছিলেন। সুতরাং হিজড়ারা সুবিধাবঞ্চিত হিসাবে আমাদের সহানুভূতি এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবে।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডার জন্মগত কোন বিষয় না। এটা সৃষ্টির বিকৃতি বা রুচিজনিত সমস্যা। এদের পিছনে রয়েছে একটি চক্র। যারা বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এদেশে LGBTQ মুভমেন্ট বাস্তবায়ন করতে চায়। ইদানীং সমতন্ত্রের ব্যানারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদের তৎপরতা দৃশ্যমান।

জনশুমারী ও গৃহ গণনা ২০২২-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে মোট হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৮১২৪ জন। তবে ইলেক্ট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যে চক্রটি হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারকে এক সাথে মিলিয়ে প্রচার করছে, তারা মূলতঃ ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক করতেই এটি করছে। এর মাধ্যমে কওমে লূতের আদর্শ বাস্তবায়নে ওরা ধাপে ধাপে এগুতে চায়।

সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ট্রান্সজেন্ডাররা কোন সুবিধা বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়। হিজড়াদের সাথে এদেরকে মিলিয়ে ফেলা প্রকারান্তরে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে অবমাননা করার শামিল।

আইন প্রনয়ণ

সম্প্রতি একাধিক দৈনিক পত্রিকা ও মিডিয়ার প্রতিবেদনে জানা যায়, "ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন ২০২৩" নামে একটি আইনের খসড়া তৈরি হয়েছে। আইনের খসড়া কপিটিতে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির পরিচয়ে বলা হয়েছে—

"ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি বলিতে বুঝাইবে—

(ক) জৈবিক লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এমন ব্যক্তি যাহাকে পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষ কোন লিঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, অথবা জন্মকালে যাহার মধ্যে লিঙ্গ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইবার কারণে লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই—এমন আন্তঃলিঙ্গ (intersex) ব্যক্তি; অথবা

(খ) এমন ব্যক্তি, শারীরিক-মানসিক ও আচরণগত বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার রূপান্তরের ফলে যাহার প্রকাশ ভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ট্রান্সজেন্ডার ম্যান বা ট্রান্সজেন্ডার উইম্যান বা সামাজিক-সংস্কৃতিগতভাবে হিজড়া নামে পরিচিত ব্যক্তিও এর আওতাভুক্ত হইবেন; অথবা

(গ) এমন ব্যক্তি, যিনি নিজেকে জেন্ডার নৈর্ব্যক্তিক (non-binary) অনুভব (perceived) করেন।"

এখানে ট্রান্সজেন্ডারের পরিচয়ের মাঝে হিজড়াকেও দাখিল করা হয়েছে, অথচ হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার টার্ম দুটির মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। হিজড়া হল জন্মগত শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ব্যক্তি আর ট্রান্সজেন্ডার হল মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ অভিব্যক্তি বা জেন্ডার সম্পর্কীয়।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত জেন্ডার বিষয়ক পাশ্চাত্যের একটি ধারণা। ট্রান্সজেন্ডার মানে হল, যার মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন থেকে ভিন্ন। এ মতবাদ অনুযায়ী শারীরিক গঠনে সুস্থ স্বাভাবিক কোন পুরুষ যদি নিজেকে নারী বোধ করে, তাহলে সে নারী। অনুরূপভাবে শারীরিক গঠনে সুস্থ স্বাভাবিক কোন নারী যদি নিজেকে পুরুষ বোধ করে, তাহলে সে পুরুষ। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গ দিয়ে নারী-পুরুষ চিহ্নিত করা হবে না; বরং নারী-পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার মাধ্যম হবে মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ। নিজেকে যা মনে করেন তিনি তা। এ মতবাদে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার জন্য সার্জারির মাধ্যমে বা হরমোন থেরাপির মাধ্যমে শারীরিক কাঠামো পরিবর্তন করা আবশ্যক নয়, করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। সর্বাবস্থায়ই সে ট্রান্সজেন্ডার। এ মতবাদ যদি আইনি বৈধতা পায়, তাহলে একজন পুরুষ নিজেকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে নারী দাবি করলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে ট্রান্সনারী এবং একজন নারী নিজেকে পুরুষ দাবি করলে সে একজন ট্রান্সপুরুষ হিসেবে গণ্য হবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার ও নিয়মাবলি তার রূপান্তরিত অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার আইন ২০২৩-এর খসড়াতে বলা হয়েছে—

“আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।
ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি কর্তৃক অনুসৃত ধর্ম অনুসারে তাহার জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারিত হইবে। যথা—
ট্রান্সজেন্ডার ম্যান-এর জন্য উত্তরাধিকারের অংশ পুরুষের অংশের অনুরূপ হইবে; ট্রান্সজেন্ডার উইম্যান-এর জন্য উত্তরাধিকারের অংশ নারীর অংশের অনুরূপ হইবে।”
এ মতবাদ দ্বারা পারিবারিক কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের সূচনা হবে। নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাও অনেকাংশে হুমকির মুখে পড়বে।
ট্রান্সজেন্ডার আইনের ভয়াবহ দিকগুলো হচ্ছে, এর দ্বারা যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। তার চেয়েও ভয়াবহ হল, এ আইনের মাধ্যমে সমকামিতার অবাধ বিস্তার ঘটবে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে তুরস্ক, চীন ও রাশিয়াসহ অনেক দেশ সোচ্চার হয়েছে; কিন্তু যদ্দুর জানা গেছে, আমাদের দেশে নাকি তা আইনি বৈধতা পেতে যাচ্ছে। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ অনেক মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে খুব ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। তার পক্ষে যুক্তি দেয়া হচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদেরকে নিয়েও খুব মাতামাতি করা হচ্ছে। যা দেশের অনেক সাধারণ জনগণের মাঝে ধোঁয়াশা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

ট্রান্সজেন্ডার আইনের অনিবার্য পরিণতি

যে সমাজ যৌনতার ক্ষেত্রে যত বেশী সহনশীল সে সমাজ তত বেশী সুস্থ ও স্থিতিশীল, এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করেই ট্রান্সজেন্ডারবাদ এগিয়ে চলছে। মূলতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদেশীদের খুঁদ-কুড়ো পাওয়ার হীন মতলবে তাদের পশুসুলভ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। আইনী বৈধতা দেওয়া হলে এ মতবাদ দেশ ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে এবং নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা উন্মোচিত হবে।একজন ছেলে মনে মনে নিজেকে নারী ভাবলে এবং দাবী করলে, আর সমাজ ও রাষ্ট্র যদি তার সেই দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে নারী সমাজে গণ্য করে তাহলে ধর্মীয়, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বহু সমস্যার সৃষ্টি হবে। নিচে তার কিছু তুলে ধরা হলো:
১. এটি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার চূড়ান্ত লঙ্ঘন। এর মাধ্যমে সৃষ্টির পরিবর্তন, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা এবং বিকৃত যৌনাচারের দ্বার উন্মোচিত হবে।

২. এর ফলে নারী-পুরুষের মাঝে ব্যবধান মুছে যাবে। এর মাধ্যমে মুছে যেতে পারে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা সহ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলি।

৩. ট্রান্সজেন্ডারবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন আইনি ও উত্তরাধিকারী সমস্যা সৃষ্টি হবে। ট্রান্সজেন্ডার আইনের মাধ্যমে পিতার উত্তরাধিকার বণ্টন, বয়েজ স্কুল, গার্লস স্কুল, কমনরুম, বাথরুম ব্যবহার সহ বহুক্ষেত্রে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হবে। কেউ নিশ্চয়ই কখনো চাইবে না যে, তার মেয়ে একটা পুরুষ থেকে মহিলা হওয়া ট্রান্সের সাথে বাথরুম বা কমনরুম ব্যবহার করুক অথবা উভয়ে একই সাথে উইমেন কলেজে পড়াশুনা করুক।

৪.যদি একজন ছেলে নিজেকে মেয়ে দাবি করে আর সে মতে কর্তৃপক্ষ তাকে মেয়ে হিসেবে গণ্য করে মেয়েদের হোস্টেলে থাকার অনুমতি দিয়ে দেয় তখন প্রকৃত মেয়েরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে।

৫. ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবি করা কথিত ট্রান্সজেন্ডার লোকটি প্রকৃত মেয়েদের সাথে অবস্থান করলে তখন মেয়েদের সম্ভ্রম ও চরিত্র হননের মোক্ষম সুযোগ গ্রহণ করবে। অনায়াসে অনেক অপকর্মে জড়িয়ে পড়বে।এই নোংরা মতবাদের এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেই চলেছে প্রতিনিয়ত।

৬. সমকামিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে দাবী করা ট্রান্সজেন্ডার মেয়েটি তখন আরেকটি ছেলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অথচ উভয়ই ছেলে।

৭. একজন প্রকৃত পুরুষ যদি কথিত ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নারীদের মত চুল লম্বা করে, বেণী করে, হাতে চুড়ি পরে, কানে দুল পরে, শাড়ি পরে এবং নারীদের বেশভূষা গ্রহণ করে নারী সাজে, তাহলে তার ব্যাপারে হাদিসে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা ও হুঁশিয়ারি এসেছে- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের উপর।

৮. বিবাহিত কোনো পুরুষ যদি হঠাৎ ট্রান্সজেন্ডার হয়ে নিজেকে মহিলা দাবি করে তাহলে সন্তানরা তাকে তখন কী বলে ডাকবে? বাবার পরিবর্তে মা ডাকবে? অনরূপ কোনো মহিলা যদি হঠাৎ ট্রান্সজেন্ডার হয়ে পুরুষ সাজে বা দাবি করে। তাহলে তার সন্তানেরা তাকে বাবা বলেই ডাকবে? না মা বলে ডাকবে? এসব প্রশ্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

৯. মিরাস তথা ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা। কারণ, আজীবন মেয়ে হয়ে থাকা একজন নারী যদি হঠাৎ পুরুষ বলে দাবি করে বসে তখন কি তাকে অন্যান্য ভাইদের মতো সমঅংশ দিতে হবে? অনুরূপ আজীবন ছেলে হয়ে থাকা একজন হঠাৎ যদি মেয়ে দাবি করে বসে। তখন তাকে কিসের ভিত্তিতে মিরাস দেওয়া হবে? অর্থাৎ মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

১০. চাকুরিসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে। প্রকৃত নারীর কোটায় কথিত ট্রান্সজেন্ডার নারী (যে আসলে পুরুষ) সে ইন্টারভিউ দিয়ে জয়েন করতে চাইবে। তাছাড়া আরও বহু নিত্য নতুন সমস্যা সষ্টি হতে পারে।

অভিশপ্ত ও ঘৃণিত এই ট্রান্সজেন্ডারবাদ এর ভয়াবহ কুফল পশ্চিমা সমাজে ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। এর নমুনা হচ্ছে, ২০২৩ সালের শুরুতে ট্রান্সজেন্ডার নারী (আসলে কিন্তু পুরুষ) প্রকৃত আরেক রুমমেট নারীকে ধর্ষণ ইস্যুতে চরম আন্দোলনের ফলে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হন। অপরদিকে এই অভিশপ্ত ও ঘৃণিত মতবাদটি বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আমদানির অপচেষ্টা চলছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের শরয়ী দৃষ্টিকোণ

আল্লাহ তাআলা পুরুষকে পুরুষ বানিয়েছেন এবং নারীকে নারী বানিয়েছেন। পুরুষকে পুরুষ হিসেবে শরীয়তের বিধান দিয়েছেন এবং নারীকে নারী হিসেবে শরীয়তের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যাকে পুরুষ বানিয়েছেন সে পুরুষ হিসেবেই জীবনযাপন করবে আর যাকে নারী বানিয়েছেন সে নারী হিসেবেই জীবনযাপন করবে। এটি নারী ও পুরুষের প্রতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান। বর্তমানকালের কুফরী মতবাদ ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মতবাদটি ইতোমধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের মূলকথা হল, কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী দাবি করে, তাহলে সে নারী, সবার তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে। তেমনিভাবে কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে সে পুরুষ, সবার তাকে পুরুষ বলে মেনে নিতে হবে। তাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি স্পষ্ট কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদ। এতে রয়েছে সৃষ্টির বিকৃতি ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়াও এটি সাধারণ রীতি-প্রকৃতি ও ইসলামের সুমহান আদর্শ পরিপন্থী একটি মতবাদ। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হল।

এক. ‘যিনার নিকটেও যেও না’ বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন

দুনিয়াতে মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখা ও বংশ পরিচয় সংরক্ষণ এবং পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইসলাম যেসব যুগান্তকারী বিধান দিয়েছে তার মধ্যে একটি হল যিনা-ব্যভিচার থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা। শুধু ব্যভিচার থেকেই নয়; বরং যেসব কাজকর্ম ও আচার-আচরণ মানুষকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে ব্যভিচারের দিকে

ধাবিত করে, সেসব থেকেও বেঁচে থাকার আদেশ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অমোঘ ঘোষণা—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দাদের জন্য ব্যভিচার ও এর নিকটবর্তী হওয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর ব্যভিচারের উপকরণ ও উপলক্ষগুলোতে জড়ানোই হল তার নিকটবর্তী হওয়া। —তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৭২

উক্ত বিধানটি নিশ্চিত করার জন্য যিনা-ব্যভিচারের সকল উপলক্ষগুলোকেও শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, যিনা-ব্যভিচারের একটি প্রধান উপলক্ষ হল দৃষ্টি। অর্থাৎ কোনো পুরুষ পরনারীকে দেখলে কিংবা কোনো নারী পরপুরুষকে দেখলে তার প্রতি দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। মনের অজান্তেই তার প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে। যা একসময় ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তাই পর-নারী, পর-পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে। তেমনিভাবে নারীকে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِن.

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তাদের কৃত কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই অবগত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সাধারণত যা প্রকাশ পায় তা ব্যতীত নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে...। —(সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। কোনো পুরুষ এক কাপড়ের নিচে অপর পুরুষের শরীরের সঙ্গে

নিজের শরীর লাগাবে না এবং কোনো নারী এক কাপড়ের নিচে অপর নারীর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না। —(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৩৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৯৩)

তেমনিভাবে পর-নারী ও পর-পুরুষের সাথে নির্জনে বা একান্তে অবস্থানকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

لاَ يَخْلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ.

কোনো পুরুষ যেন অপর নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৬৫)

এমনকি নারীকে তার মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী কিংবা অন্য নারীর সাথে হজের মতো ফরয বিধান পালন করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَحُجّنّ امْرَأَةٌ إِلّا وَمَعَهَا ذُو محْرم.

মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেন হজ না করে। —(সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২৪৪০ আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬)

আর সঙ্গত কারণেই সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তাদের শয্যা পৃথক করে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের আদেশ করো। আর দশ বছর হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরের শয্যা পৃথক করে দাও। —(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের এক স্বভাবজাত প্রকৃতি। নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের মাঝে এই আকর্ষণ জাগ্রত হয়। পৃথিবীর শুরু থেকে সকল যুগে ও সকল ধর্মে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান ছিল। সর্বশেষ শরীয়ত ইসলামে যেমন ধর্ষণ-ব্যভিচার হারাম ও নিষিদ্ধ তেমনি পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুসহ সকল ধর্মেও তা নিষিদ্ধ ছিল। দুনিয়ার সাধারণ রীতি, জ্ঞান-যুক্তি ও বিজ্ঞান সকল বিচারেই তা যথার্থ।

ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত রাখার আদেশ করে অন্যদিকে তা চরিতার্থ করার জন্যও দিয়েছে সুন্দর ও সুমহান বিধান। একদিকে যেমন ঘোষণা হয়েছে—

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

“যে তার দুই চোয়াল ও দুই উরুর মধ্যস্থিত অঙ্গের (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) জামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব”। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪)

অন্যদিকে ইরশাদ হয়েছে—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তির চাহিদা প্রশমনকারী।” —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৬৫)

বস্তুত শরীয়তের এই একটি বিধান যদি নিশ্চিত করা যায় এবং ব্যভিচার ও এর সকল উপলক্ষ থেকে মানুষ নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাহলে ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ-রাষ্ট্রসহ সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। সুখী ও সমৃদ্ধ একটি সমাজ গড়ে উঠবে।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত অবাধ, যথেচ্ছ ও বিকৃত উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দ্বার উন্মোচন করে। যার ফলে সমাজে সমকামিতা, বেহায়াপনা ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। বস্তুত মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো সুযোগ তো এতে থাকছেই না; বরং যথেচ্ছ প্রবৃত্তি-চারণের সুযোগ তৈরি হয়।

তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডারবাদে সন্তান ধারণ ও সন্তান লালন-পালনের মতো কোনো বিষয় নেই। এগুলো থেকে বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ শুধু নিজের প্রবৃত্তিকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করতে শেখায়। সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের ঝামেলায় জড়াতে উৎসাহিত করে না। এতে করে একদিকে যেমন দুনিয়ায় মানবের বংশধারা ব্যাহত হবে, তেমনি তার বংশবিস্তারও লোপ পাবে। যার দরুন সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বে এক মহাবিপর্যয় তৈরি হবে। অথচ ইসলামী শরীয়তে মানবের বংশ বৃদ্ধিই কাম্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

“তোমরা অধিক মহব্বতকারী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর আধিক্যের গর্ব করব”। —(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৫৯৪)

দুই. সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় সুরক্ষিত রাখার বিধান লঙ্ঘিত হয়

ইসলামী শরীয়ত সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এর জন্য সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ.

"সন্তান হল বৈধ স্ত্রীর জন্য আর ব্যভিচারিণীর জন্য হল বঞ্চনা"। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৫৮)

একারণে বিবাহ বহির্ভূত মেলামেশা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারী সন্তানকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না; বরং তার জন্য ইসলামের পৃথক বিধিবিধান রয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.

"যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন নারী অথবা বাদীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (আর এতে কোনো সন্তানের জন্ম হয়) তাহলে সেটা জারজ সন্তান। সে ব্যভিচারী থেকে মিরাস পাবে না এবং ব্যভিচারীও তার থেকে মিরাস পাবে না।" —(জামে তিরমিযী, হাদীস ২১১৩)

আর সঙ্গত কারণেই ইসলামে পরকীয়া ও বহুগামিতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ ... قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কী?...

আমি আবারো আরয করলাম, এরপর কোন টি ? তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। " —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৬)

রুফাই ইবনে সাবেত আনসারী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَه زَرْعَ غَيْرِه، يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحُبَالَى.

"আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের ক্ষেতে সেচ দেওয়া অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।" —(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৩১)

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে মানবের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় বলতে কিছুই থাকবে না। কেননা, এই মতবাদ অনুসারে একজন ব্যক্তি ফন্দি খাটিয়ে যখন তখন নিজেকে একেক লিঙ্গের ঘোষণা করে অবাধ বেহায়াপনায় লিপ্ত হতে পারে।

তিন. নারী-পুরুষ একে অপরের নিষিদ্ধ সাদৃশ্য অবলম্বন

ইসলাম নারী-পুরুষকে একে অপরের সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নিষেধ করেছে। এটি জঘন্যতম কবীরা গুনাহ ও লানতযোগ্য কাজ। হাদীসে এ ধরনের নারী ও পুরুষের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত—

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর সাদৃশ্য ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য ধারণকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৬৮৩৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.

পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী ও নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়। —(আলজামিউস সগীর, হাদীস ৭৬৫৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৮৭৫)

বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত সাদৃশ্য দুই ধরনের হতে পারে। যথা : সাময়িক ও অস্থায়ী এবং স্থায়ী। উভয় প্রকারের সাদৃশ্যই নিষিদ্ধ। সাময়িক সাদৃশ্য সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

لعن الله الواشِمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. ...

“সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উল্কি আঁকিয়ে ও যে এঁকে দিতে বলে, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী ও দাঁত সরু করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। কেননা, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়।” ... —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৫)

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, “জনৈকা নারী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বসন্ত রোগে আমার এক মেয়ের মাথার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা স্থাপন করব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

لعن الله الواصلة والمَوصولة.

“ পরচুলা স্থাপনকারী নারী ও পরচুলা ব্যবহারকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত। “ —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪১)

আর স্থায়ী সাদৃশ্য (যা 'তাবদীলু খালকিল্লাহ' তথা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত।) হলো অঙ্গ সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে পুরুষের জন্য নারীর অথবা নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি ধারণ করা। যেমন কোনো পুরুষের খোজা হওয়া। ইসলামে এটিও নিষিদ্ধ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি খোজা হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৭১)

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে এই অভিশপ্ত সাদৃশ্যই ধারণ করা হয়। কখনো অস্থায়ী ও সাময়িক সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। যেমন, পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয়। আবার কখনো সার্জারির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। যেমন, ছেলে হয়ে মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা কিংবা মেয়ে হয়ে ছেলের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা ও নিজের মেয়েলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ করা ইত্যাদি।

চার. ট্রান্সজেন্ডারবাদে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সবচেয়ে জঘন্য ও গর্হিত দিক হল, এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন সম্পূর্ণ হারাম ও জঘন্যতম কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا، اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا وَ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا، لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا، وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا، يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا، اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এটি ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সবকিছু ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে লানত করেন। আর সে বলে, আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব। তাদের অন্তরে মিথ্যা আশা-ভরসা সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে। তাদেরকে আরো আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। আর শয়তান তাদেরকে শুধু প্রবঞ্চনারই

প্রতিশ্রুতি দেয়। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং তারা সেখান থেকে পলায়নের কোনো পথ পাবে না"। —সূরা নিসা (৪) : ১১৬-১২১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রাহ. উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন—

وَهَذِه الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِ فَاعِلِهَا، وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ لِأَجْلِهَا، فَقِيلَ: لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ. وَقِيلَ: مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحّ.

হাদীসসমূহ থেকে সাদৃশ্যের উপরিউক্ত সকল কাজ লানতযোগ্য হওয়া ও কবীরা গুনাহ হওয়া প্রতীয়মান হয়। তবে এসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে কী তাৎপর্য রয়েছে, সে সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। কেউ বলেন, এটি তাদলীস। আর কারো মতে, এটি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ মত। —তাফসীরে কুরতুবী ৫/২৫২; আলমুফহিম লিমা উশকিলা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম ৫/৪৪৪

পাঁচ. ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি ঈমান বিধ্বংসী কুফরি মতবাদ

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা সন্তান হওয়া-না হওয়া, সন্তানের ছেলে বা মেয়ে হওয়া একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে। এতে কারো কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। কোনো চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ওষুধ-পথ্য কিংবা কোনো ডাক্তার-কবিরাজের এতে কোনো এখতিয়ার নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। "—সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে যখন তখন ছেলে বা মেয়ে বনে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো হয়। যা সৃষ্টির বিকৃতির পাশাপাশি ঈমান বিধ্বংসীও বটে। তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা পেলে আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত ও কুরআন সুন্নাহের অসংখ্য বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন ও চরম বিকৃতি ঘটবে। এর মাধ্যমে ইসলামের সালাত, হজ, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশপরিচয়, পর্দা, সতর, শাহাদাহ (সাক্ষ্যদান), কাযা, ইমামাত (নামাযের ইমামতি), রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ও মীরাস-

উত্তরাধিকারসহ নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বহু বিধানের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটবে।

ছয়. ট্রান্সজেন্ডারবাদ হলো আল্লাহর অভিশপ্ত মতবাদ

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি একত্ব এবং নৈতিকতার ব্যাপারে কতিপয় সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। এই সহজাত অনুভূতিকে হাদীছের ভাষায় বলা হয় ফিতরাত। আর এই সহজাত প্রবৃত্তির বা ফিতরাতের সাথে বাস্তবতার সামঞ্জস্য মূলতঃ ইসলামী শরী'আতের সৌন্দর্য। এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করা সেক্যুলার সমাজব্যবস্থা। পদে পদে মানুষের এই ফিতরাতকে নষ্ট করে দিয়ে নফস ও পশুত্বকে উস্কে দেয়। তারা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পরিচয় ও ভূমিকাকে। ফলশ্রুতিতে এক যুগে যেটা অসুস্থতা অন্য যুগে সেটা আবশ্যিকতা।

আল্লাহ বলেন,أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' (ফুরক্বান ২৫/৪৩)।

তিনি আরো বলেন,

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا'

'আর আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়' *(নাবা ৭৮/৮)*।

আল্লাহ মানুষকে দুইভাবে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ। এর বাইরে ট্রান্সজেন্ডার বা সমলিঙ্গের ধারণা বলতে কিছুই নেই। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى 'শপথ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও মাদী' *(লায়ল ৯২/৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে চান পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

উল্লেখ্য, একজন পুরুষের লিঙ্গ পরিবর্তন বা ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার অর্থ হলো- তার পুরুষাঙ্গ ও অন্ডকোষ কেটে ফেলা, বুকে কৃত্রিম স্তন বসানো। অনুরূপ নারীদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার অর্থ হলো- তার শরীর থেকে স্তন, জরায়ু এবং গর্ভধারণের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ কেটে ফেলা এবং শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে কিছু মাংসপেশী নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি পুরুষাঙ্গ স্থাপন করা।

অথচ আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

‘অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে’ (তীন ৯৫/৪)। তার সৃষ্টির এমন বিকৃতি ঘটানোর অর্থ হলো প্রকৃত অর্থে আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ করা। আর এটা জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ বলেন, ‘তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর ফিতরাত অনুযায়ী চল, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই’ (রূম ৩০/৩০)।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যেখানে সৃষ্টির সামান্য পরিবর্তনের জন্য রাসূল (ছাঃ) অভিসম্পাত করছেন, সেখানে একজন পুরুষ বা নারী লিঙ্গ পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে পরিবর্তন করলে তার শাস্তি কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়।

আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় সমকামীদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,ْمَن

وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ ِ

‘তোমরা কাউকে যদি লূত গোত্রের মতই কুর্কমে লিপ্ত দেখতে পাও, তাহ’লে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা কর’।

এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতিবিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দন্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধ।

তবে কোন পুরুষের যদি মেয়েলি কিছু আলামত থাকে অথচ বাস্তবে সে একজন পুরুষ কিংবা কোন নারীর যদি পুরুষালি কিছু আলামত থাকে অথচ ব্যস্তবে সে একজন নারী, সেক্ষেত্রে সার্জারী বা ঔষধ গ্রহণ করে সেই সমস্যার সমাধান করা জায়েয। যেটিকে লিঙ্গ পরিবর্তন নয় বরং লিঙ্গ সংরক্ষণ করা বলা হয়।

সাত. ট্রান্সজেন্ডারবাদ শয়তানের অনুসরণ

পশ্চিমা যৌনবিকারগ্রস্ত কিছু অমুসলিম গবেষক এ মতবাদের জন্ম দিয়েছে। একশ্রেণির মিডিয়া এবং পশ্চিমা মদদপুষ্ট কিছু এনজিও আমাদের দেশে এ ভয়ংকর মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করছে। এ দেশের ঈমানদার মুসলিম জনগণ এটা কিছুতেই মেনে নেবে না।

আল্লাহ তাআলা যাকে পুরুষ বানিয়েছেন তাকে নারী বলা, যাকে নারী বানিয়েছেন তাকে পুরুষ বলা, এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন। আল্লাহর হুকুমের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহর শ্বাশ্বত বাণীর চরম লংঘন। এটা শয়তানী চেষ্টা, শয়তানই মানুষকে দিয়ে এমন কাজ করিয়েছে। দেখুন, কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে বলেছে, আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন শয়তানের কাজ। এজন্য আল্লাহ তাআলা শয়তানকে অভিসম্পাত করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

...لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا، وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا، يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا، اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

"...শয়তানকে আল্লাহ লানত করেছেন। সে (আল্লাহকে) বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্ধারিত এক অংশকে নিয়ে নেব। এবং আমি তাদেরকে সরল পথ থেকে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়। সে ওদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সকলের ঠিকানা জাহান্নাম। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য পালানোর কোনো পথ পাবে না।" - সূরা নিসা (০৪) : ১১৮-১২১

শয়তান মানুষকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেওয়ার হুকুম করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার হুকুম হল-

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখ। আল্লাহর সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন সাধন নেই (অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন করো না)। এটাই সম্পূর্ণ সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" -সূরা রূম (৩০) : ৩০

কুরআন কারীমের এ আয়াতগুলো একটু খেয়াল করে পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ পুরোপুরি শয়তানী মতবাদ। আল্লাহ তাআলার দেওয়া হেদায়েত এবং তাঁর নাযিলকৃত শরীয়তের সাথে এর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই; বরং তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ মতবাদ অনুযায়ী কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী দাবি করে, তাহলে তার দাবি সবাইকে মেনে নিতে হবে। সে এখন অপর ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অথচ ছেলে ছেলে বিয়ে স্পষ্ট সমকামিতা। একইভাবে কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে তার দাবি সবাইকে মেনে নিতে হবে। সে এখন অপর নারীকে বিয়ে করতে পারবে। রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজ তাকে বাধা দিতে পারবে না। অথচ নারীতে নারীতে বিয়ে স্পষ্ট সমকামিতা। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সমকামিতা যে জঘন্য

হারাম কাজ, তা তো সবারই জানা। এ অপরাধের কারণেই হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওমের উপর কঠিন আসমানী আযাব এসেছিল, যা কুরআন কারীমের বহু সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। ট্রান্সজেন্ডারবাদের অসারতা ও এর ভয়াবহতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইসলামে তৃতীয় লিঙ্গ বলতে কিছু নেই

আমাদের জান, মাল, সময়, সম্পদ, শরীর সব ক্ষেত্রে সব অধিকারের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ নিজে তার অধিকার আবিষ্কার করে না। রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রার্থীর শক্তি অধিকার তৈরি করে না। জাতিসংঘের কোন দলিল কোন সংবিধান বা মানুষের ধ্যান-ধারণা থেকে অধিকার আসে না। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তা অনুমোদন দেওয়ার অধিকার মানুষের নেই। মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হল আল ফুরকান যার অর্থ হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম নির্ধারিত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ এবং তার রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল। (তরজমা, সূরা: আল-আহযাব, আয়াত-৩৬)

মানুষ নারী বা পুরুষ:

ইসলাম আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের তৈরি করা শ্রেণীবিভাগ।

'আর তিনি যুগল সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী '(তরজমা সূরা : আর-নাজম, আয়াত ৪৫)

'আর শপথ তার যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী ' (তরজমা, সূরা : লাইল, আয়াত ৩)

'বস্তুত পুত্র কন্যার মতো নয়'(তরজমা, সূরা: আলে-ইমরান, আয়াত-৩৬)

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নির্দশনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে। " (তরজমা, সুরা: আর-রুম, আয়াত ২১)

মহান আল্লাহ তা'আলা দেহ আর আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তিনি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানব জাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই। যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে তাদের শরীরও পুরুষ বা নারী কোনো একটির দিকে প্রাধান্য থাকে এবং সেটা অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়। রসুল (সা:) দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি এমন হিজড়াদের পুরুষ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি এমন হিজড়াদের নারী হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারো মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থাকে, সে ক্ষেত্রে কোন দিক দিয়ে সে প্রসাব করে তার ভিত্তিতে তাকে নারী বা পুরুষ গণ্য করা হবে। এভাবেও বোঝা যদি সম্ভব না হয় তাহলে বয়সন্ধির সাথে জড়িত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাতে হবে ।যদি একেবারে কোনভাবেই বোঝা না যায় তাহলে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরের প্রজনন ব্যবস্থা কি শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি নাকি ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তা খুব সহজেই জানা সম্ভব। কাজেই ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই। কোন ব্যক্তির প্রজননব্যবস্থা পুরুষের, কিন্তু যৌন বিকাশের ত্রুটির কারণে বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এমনক্ষেত্রে সেই ত্রুটি দূর করার জন্য শর্তসাপেক্ষে অস্ত্রোপচারের বৈধতা আধুনিক আলিমগণ দিয়েছেন। একই কথা নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই ধরনের অস্ত্রোপচার সীমিত পরিসরে জায়েজ এবং এর উদ্দেশ্য হল একজন মানুষের শরীরকে তার দেহের প্রজননব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, বিকলাঙ্গতা দূর করা। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারবাদের লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের লিঙ্গ পরিবর্তন জাতীয় কোন অস্ত্রোপ্রচার ইসলামী শরিয়ায় বৈধ না।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহ কুফল

আল্লাহর দেয়া বিধান ও সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত এই কুরুচিপূর্ণ ও অবাধ যৌনাচারের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে বর্তমানকালে প্রকাশ পায় ‘ট্রান্সজেন্ডারবাদ’। মানবতা বিরোধী এবং মানবিক রুচি ও চাহিদার সম্পূর্ণ বিপরীত এই ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি এদেশে আমদানি করার কোনো যুক্তি নেই। পশ্চিমারা রুচি ও বিবেকবর্জিত অনেক কিছুই করে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে এখন কুকুর-শৃগাল হওয়ারও প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। কুকুরের বেশভূষা ও চলাফেরা ধারণ করতে বিকৃত রুচির মানুষের সংখ্যা অনেক। মানুষের চিরায়ত ও সুস্থ রুচি-প্রকৃতির পরিপন্থী এবং ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহবিরোধী এই কুফরি মতবাদ আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন প্রদত্ত নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করার শাশ্বত নিয়ম ভেঙে দিয়ে মানবসমাজকে মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সব দিক থেকে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের চূড়ান্ত পরিণতি অভিসপ্ততা ও ধ্বংস

ট্রান্সজেন্ডারবাদ পুরোপুরি শয়তানী মতবাদ। আল্লাহ তাআলার দেওয়া হেদায়েত এবং তাঁর নাযিলকৃত শরীয়তের সাথে এর ন্যূনতম সম্পর্ক নেই; বরং তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

এ অপরাধের কারণেই হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওমের উপর কঠিন আসমানী আযাব এসেছিল, যা কুরআন কারীমের বহু সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ، اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ، وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ، فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ، وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

"এবং লূতকে (পাঠালাম)। যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা তো কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও! বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই কথা যে, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়'। পরিণামে আমি তাকে (অর্থাৎ হযরত লূত আলাইহিস সালামকে) ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকল (যারা আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়)। আর আমি তাদের উপর (পাথরের) প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখ, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল।" -সূরা আ'রাফ (০৭) : ৮০-৮৪

রসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না, যে সমকামে লিপ্ত হয়। ' (ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস নং- ১৬৮০৩, তিরমিযী, হাদিস নং- ১১৬৫)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কোন জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি যে কওমে লুতের অনুরূপ করে। ' (মুসনাদ ইমাম আহমাদ, সহীহ আল-জামি'আল আলবানী)

ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে কওমে লুতের ঘটনায় রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা। স্বয়ং আল্লাহ এবং রসুল সা: এই মতবাদকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন। কাজেই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের পরিনতি খুবই ভয়াবহ। ধর্ম ও সমাজ উভয় দিক থেকেই সমকামিতা মারাত্মক অপরাধ। আমাদের দেশের আইনেও তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কুরআন-সুন্নাহর বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ:

সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারী দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে দিয়েছেন। আবার নারী-পুরুষ সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পাশাপাশি প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যও ভিন্ন করে দিয়েছেন। আর নিজ নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপযোগী করে নারী-পুরুষের প্রত্যেককে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের জন্য দিয়েছেন পৃথক পৃথক জীবনব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ করেছেন শরীয়তে ইসলামীর পৃথক বিধিবিধান। যার ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ মহাজগতের সবকিছু সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য, ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবি অনুযায়ী পৃথিবীতে কোনো লিঙ্গ পরিচয় থাকবে না। শারীরিক লিঙ্গ বিবেচনায় মানুষের পরিচয় নির্ণয় হবে না; বরং মানসিক ইচ্ছাটাই হবে তার প্রধান পরিচয়। কেউ যদি তার জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী না হয়, তাহলে সে মনের ইচ্ছাধীন যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারবে। অর্থাৎ একজন পুরুষের যদি নিজেকে নারী বলে মনে হয়, তাহলে সে নারী। অনুরূপ কোনো নারীরও যদি নিজেকে পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ।

ট্রান্সজেন্ডারবাদে আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলামের সালাত, হজ্ব, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশপরিচয়, পর্দা-সতর, শাহাদাহ (সাক্ষ্যদান), কাযা, ইমামাত (নামাযের ইমামতি) ও মীরাস-উত্তরাধিকারসহ নারী-পুরুষ সংক্রান্ত কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বহু বিধান সরাসরি লঙ্ঘিত হয়। এর দ্বারা কুরআন কারীমের এক-দুটি আয়াত নয়; বরং দু'শরও অধিক আয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত শত হাদীসেরও বিরুদ্ধাচরণ হবে। তাছাড়া এটি হবে সকল নবী,

রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীসহ সকল মুমিন-মুসলিমের পথ তথা জান্নাতের পথ ছেড়ে অভিশপ্ত শয়তানের পথ তথা জাহান্নামের পথ অবলম্বন।

বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা :

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ হবে নারী ও পুরুষের মাঝে। কিন্তু এ মতবাদ মেনে নিলে একজন ট্রান্সনারী (বাস্তবে পুরুষ) অপর পুরুষকে বিবাহ করার সুযোগ পাবে। অনুরূপভাবে একজন ট্রান্সপুরুষ (বাস্তবে নারী) অপর নারীকে বিবাহ করার সুযোগ পাবে। পুরুষে পুরুষে বিয়ে বা নারীতে নারীতে বিয়ে তো স্পষ্ট সমকামিতা।

শরীয়ত মোতাবেক একজন নারীর জন্য একসঙ্গে একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি নেই। অথচ এ মতবাদ মেনে নেয়া হলে একজন ট্রান্সপুরুষের (বাস্তবে নারী) একাধিক ট্রান্সনারীকে (বাস্তবে পুরুষ) বিয়ে করার সুযোগ তৈরি হবে। এ ছাড়া পরিবার ও সংসারেও দেখা দিবে চরম বিশৃঙ্খলা। কে পিতা, কে মাতা, কে ভাই, কে বোন তা নিয়েই তৈরি হবে ভয়াবহ জটিলতা। এত দিন ধরে যিনি পিতা ছিলেন, হঠাৎ তিনি নারী হয়ে গেলে, তেমনিভাবে এতদিন ধরে যিনি মা ছিলেন, হঠাৎ তিনি পুরুষ হয়ে গেলে পরিবার ও সংসারের কী হবে!! ইসলামী শরীয়াতে যেখানে পুরুষকে নারীর পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে, নারীকে পুরুষের বেশ-ভূষা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীরূপ ধারণকারী পুরুষদের উপর এবং পুরুষরূপ ধারণকারী নারীদের উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমরা ঘর থেকে বের করে দাও।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুককে (তাঁর ঘরে আসলে) বের করে দিয়েছেন এবং অমুককে উমর রা. বের করে দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৬)

অপর হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

“আল্লাহ লানত করেন আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারী ঐ সকল নারীর প্রতি, যারা অন্যের শরীরে উল্কি অঙ্কন করে এবং নিজ শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়। যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু-চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে।” -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব পুরুষকে লানত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং ঐসব নারীকে লানত করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫)

অপর হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন এমন পুরুষের উপর, যে নারীর মতো পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারীর উপর, যে পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করে। " -(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৩০৯)

সেখানে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তো এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। এ মতবাদ শুধু পোশাক আর বেশভূষা পরিবর্তন নয়, গোটা পরিচয়ই পাল্টে দিতে বলছে। আপাদমস্তক পুরুষকে বলা হচ্ছে নারী! আপাদমস্তক নারীকে বলা হচ্ছে পুরুষ! কত মারাত্মক বিকৃতি!!

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ফলে পারিবারিক বিপর্যয় :

বস্তুত ট্রান্সজেন্ডারবাদ মতবাদটি এতটাই অসার ও অযৌক্তিক যে, এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; বরং গোটা পৃথিবীতেই বিপর্যয় নেমে আসবে। যেমন ধরুন, রফিক সাহেবের ৪ মেয়ে। তাদের একটি ছেলের খুব শখ। অনেক দুআ-প্রার্থনার পর তার ঘরে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হল। রফিক সাহেব তো মহা খুশি। এলাকার সবাইকে তিনি দাওয়াত করে খাইয়েছেন। ছেলের আদর-যত্নের যেন কোনো কমতি নেই। ছেলেকে নিয়ে তাদের কত স্বপ্ন! ছেলেকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করাবেন। লেখাপড়া শেষে ভালো একটা চাকরি করবে। এরপর ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বউ ঘরে আনবেন। শেষ বয়সে তারা ছেলে ও ছেলের বউ এবং তাদের নাতি-নাতনি নিয়ে মহাসুখে দিন কাটাবেন। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ছেলেকে নামকরা একটা স্কুলে ভর্তি করালেন। এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেল। ছেলের বন্ধু-বান্ধব, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ এলাকার সবার মুখেই তিনি ছেলের প্রশংসা শোনেন। এমন একটি ছেলের পিতা হতে পেরে নিজেকে তিনি গর্বিত বোধ করেন। কিন্তু ছেলেকে একটা ভালো কলেজে ভর্তি করানোর জন্য রফিক সাহেব যখন খুব উদ্বিগ্ন। ঠিক তখনই যেন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। কারণ একদিন তিনি শুনতে পারলেন, তার ছেলেটি নাকি মেয়ে হয়ে গিয়েছে!

এখন থেকে রফিক সাহেবের ছেলের নিজেকে মেয়ে মনে হচ্ছে। তাই আইন ও সমাজসহ সকলের তাকে মেয়ে হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

আচ্ছা ধরে নিলাম, সে এখন মেয়ে। সমাজ ও আইনের চোখেও সে এখন থেকে মেয়ে হিসেবেই বিবেচিত হবে। কিন্তু এই বিবেচনাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? ধরুন, রফিক সাহেব তাকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে একটা ওমেন্স কলেজে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে গেলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে আইনী কারণে মেয়ে হিসেবেই বিবেচনা করলেন এবং ভর্তিচ্ছু অন্যান্য মেয়েদের মতো তার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের জন্য এসএসসির সার্টিফিকেট, মার্কশিট ইত্যাদি কাগজপত্র দেখলেন। কিন্তু সেখানে সবকিছুতেই তো ছেলের নাম লেখা। তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কীভাবে নিশ্চিত হবেন যে, এই মেয়েই আগে ছেলে ছিল আর এই সার্টিফিকেট, মার্কশিটসহ সকল কাগজপত্র এই মেয়ের? হয়তো কেউ সমাধান বাতলে দিতে পারেন যে, কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে তার পূর্বের সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো সংশোধন করে নেবে। কিন্তু তাতেই কি সকল সমাধান হবে। বরং নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াবে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা: ট্রান্সজেন্ডারবাদকে স্বাভাবিকীকরণ করলে অনৈতিকতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার দুয়ার খুলে যাবে। প্রথমত, ট্রান্সজেন্ডারবাদ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে চরম সীমালঙ্ঘন। এ ছাড়াও ট্রান্সজেন্ডারবাদ সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা স্বাভাবিকীকরণ ও আল্লাহ নির্ধারিত পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের পথ অবমুক্ত করে দিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত, ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা পেলে সমাজে যিনা-ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী দাবি করে আর দেশের আইন তা মেনে নেয়, তাহলে সে আবাসিক হোটেল বা বাসা-বাড়িতে কিংবা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির ছাত্রী হোস্টেলে নারীদের সাথে থাকার সুযোগ পাবে। মেয়েদের জন্য নির্ধারিত সকল স্থানে অনায়াসে যেতে পারবে। অনুরূপভাবে কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে আর দেশের আইন তাকে পুরুষ বলে মেনে নেয়, তাহলে সে আবাসিক হোটেলে, বাসা বাড়িতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে পুরুষদের সাথে থাকার সুযোগ পাবে। এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ হবে তা বলাই বাহুল্য। পূর্বে ঘটমান এমন অনেক ঘটনার নজির রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো:

১৭ জুলাই ২০২২ ঈসায়ীতে নিউইয়র্ক পোস্টের এক খবরে বেরিয়েছিল, আমেরিকার নিউজার্সি রাজ্যের জেলখানায় ডেমি মাইনর নামের এক পুরুষ কয়েদী হঠাৎ করে নিজেকে নারী দাবি করতে শুরু করে। পরে জেলখানা কর্তৃপক্ষ ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ অনুযায়ী তাকে

মহিলা কারাগারে স্থানান্তরিত করে। কারাগারে নারীদের সাথেই রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিকে। ফলে তার সান্নিধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদী। এ ঘটনার পর তাকে পুনরায় পুরুষের কারাগারে পাঠানো হয়।

এ মতবাদ সমাজে স্থান পেলে শুধু যিনা-ব্যভিচারই নয়, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণও অতি সহজে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। কোনো নারী নিজের সমলিঙ্গের মনে করে নারীরূপী কোনো পুরুষের সাথে থাকলে তার কাছ থেকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। অসৎ লোকেরা ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সহজে নারীদের কাছে পৌঁছার জন্য এই পথ বেছে নেবে। ফলে সমাজে নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

সামাজিকভাবে নারীদের জন্য নির্ধারিত পরিসরে নারী দাবি করা পুরুষদের অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয়া। নারীদের কমনরুম, টয়লেট, প্রিজন ওয়ার্ড ইত্যাদিতে নারী দাবি করা পুরুষদের প্রবেশাধিকার দেয়াটা বিপজ্জনক। এর কিছু ফলাফল আমরা পাশ্চাত্যে ইতোমধ্যেই দেখেছি। ইসলা ব্রাইসন নামের আরও একজন পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া ট্রান্সজেন্ডার জেলের ভেতর দু'জন নারী বন্দীকে ধর্ষণ করে। পাশ্চাত্যে নারী ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোতে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের অংশগ্রহণ ইতোমধ্যেই অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়াও ট্রান্সজেন্ডারবাদ আইনি ক্ষেত্রেও ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। উত্তরাধিকার, শিশুর কাস্টোডি ইত্যাদি বিষয়ে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে।

তৃতীয়ত, ট্রান্সজেন্ডারবাদের অবধারিত ফলাফল হচ্ছে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা স্বাভাবিকীকরণ। নারী দাবি করা একজন পুরুষ যদি নারী হিসেবে আইনি স্বীকৃতি পেয়ে কোনো পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয় তা হবে স্পষ্ট সমকামিতা; আর যদি সে অন্য কোনো নারীর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয় তাহলে তা কার্যত সমকামিতা না হলেও সমাজের চোখে তা হবে সমকামিতা। উভয় ক্ষেত্রেই সমকামিতাকে প্রমোট করা হবে।

চতুর্থত, ট্রান্সজেন্ডারবাদকে স্বাভাবিকীকরণ করা হলে পরিবার ও সমাজের ধ্বংস হবে অনিবার্য। পরিবার গঠিত হয় নারী ও পুরুষের পরিপূরকতাকে কেন্দ্র করে, যাদের মিলনের ফলে জন্ম নেয় একটি মানবশিশু। পরিবারের ছায়াতলে এ শিশু বেড়ে উঠে; মানবীয় গুণাবলি অর্জন করে। নারী-পুরুষের এই পরিপূরকতার মূল হচ্ছে তাদের লৈঙ্গিক পার্থক্য ও অপরিবর্তনীয়তা। এ লৈঙ্গিক পার্থক্য ও অপরিবর্তনীয়তাকে যখন অস্বীকার করা হয় তখন পরিবার, সমাজ, আইন, বিয়ে ইত্যাদি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

উত্তরাধিকার বা মীরাস সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা :

শরীয়া আইনে মীরাসের ক্ষেত্রে দুজন মেয়েকে একজন ছেলের সমান গণ্য করা হয়। দুজন মেয়ে একজন ছেলের সমান উত্তরাধিকারের অংশ পায়। কিন্তু এ মতবাদ অনুযায়ী ট্রান্সপুরুষ

(বাস্তবে নারী) পুরুষের সমান গণ্য হবে। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার খসড়া আইনেও এটি রয়েছে যে, "ট্রান্সজেন্ডার ম্যান-এর জন্য উত্তরাধিকারের অংশ পুরুষের অংশের অনুরূপ হইবে; ট্রান্সজেন্ডার উইম্যান-এর জন্য উত্তরাধিকারের অংশ নারীর অংশের অনুরূপ হইবে।" অথচ এটি সরাসরি কুরআনের নির্দেশের লঙ্ঘন; বরং বিরুদ্ধাচরণ। কুরআনের যে কোনো বিধানের বিরুদ্ধাচরণেরই শাস্তি জাহান্নাম। মীরাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছে-

وَ مَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর (স্থিরীকৃত) সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। সূরা নিসা (৪) : ১৪

এভাবে ইসলামের অনেক বিষয়ে বিধানগতভাবে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ মতবাদ মেনে নেওয়া হলে ঐসব বিধানে নারীর জন্য পুরুষের বিধান আর পুরুষের জন্য নারীর বিধান চালিয়ে দেওয়া হবে, যা শরীয়ত বিকৃতির ভয়ংকর রূপ। মোটকথা, ট্রান্সজেন্ডারবাদ এতই ভয়ংকর একটি বিষয় যে, সামাজিক ও আইনগতভাবে যদি একে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাহলে পুরো সমাজব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেবে এবং বড় বড় সব অপরাধ অবাধে ছড়িয়ে পড়বে। দেশ, জাতি ও সমাজ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তাঁর দেওয়া বিধি-বিধানে হস্তক্ষেপ করা হবে, যা স্পষ্ট কুফরী।

মানসিক অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ

ট্রান্সজেন্ডার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আবদার জানায়। একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে নিতে বলা কিংবা একজন নারীকে পুরুষ হিসেবে মেনে নিতে বলার অর্থ হলো বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে বলা। বিভ্রান্তি ও বিকৃতির স্বীকৃতি দেওয়া।

অ্যানোরেক্সিয়া (Anorexia) নামের রোগ হলে মানুষের খাওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক রকম কমে যায়। সব সময় ওজন বেড়ে যাওয়ার আতঙ্ক কাজ করে। অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে। এ ধরনের রোগীরা বিপদজনক রকমের আন্ডারওয়েট হলেও নিজেদের মোটা ভাবে। তাদের এই ভাবনাকে কি মেনে নেওয়া উচিত নাকি তাদের চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং দরকার। ঠিক তেমনিভাবে বডি আইডেন্টিটি ইন্টেগ্রিটি ডিসঅর্ডার নামে একটা মানসিক রোগ আছে।

এই রোগ হলে রোগী মনে করতে শুরু করে যে তার শরীরের কোন একটা অংশ আসলে তার নয়। হয়তো নিজের ডান পা কে তার কাছে অপরিচিত লাগতে শুরু করে তখন সে ঐ পা কেটে বাদ দিতে চায়। শারীরিকভাবে তাদের কোন সমস্যা নেই। শরীরের যে অংশটা তারা বাদ দিতে চাচ্ছে সেখানেও কোন সমস্যা নেই। সমস্যাটা তাদের মনে। কোন কারনে অপারেশন করে হাত বা পা কেটে ফেলতে হয়েছে এমন মানুষের প্রতি এই ধরনের রোগীদের মধ্যে ঈর্ষা কাজ করে। এমন রোগীদের চিকিৎসা হওয়াই উচিত নয়। তাদেরকে অপারেশন করে নিজেদের হাত-পা কেটে ফেলতে দেওয়া উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সবাই বলবে শরীর সুস্থ রোগটা মনে। অসুস্থ মনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শরীরের ক্ষতি না করে মনের চিকিৎসা করা জরুরী। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারবাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তার উল্টো কথা। মনের সমস্যার চিকিৎসার জন্য মাথা ব্যাথা নেই। শুধু শরীর বদলাতে বলা হচ্ছে। মনের অসুখের চিকিৎসার বদলে শরীরকে বদলানো হচ্ছে। কেউ এসে বলছে ট্রান্সজেন্ডার, ব্যাস সেটা মেনে নিয়ে বলা হচ্ছে শরীর বদলে ফেলতে। মনের রোগ ভালো করার নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ। তাই কিছু মানুষের মানুসিক বিকারের কারণে পুরো সমাজকে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আইন পাল্টাতে। এটা কোনোভাবে যৌক্তিক হতে পারে না। 'মনে হওয়া' নিছক আবেগ আর অনুভূতি দিয়ে বাস্তবতাকে ভুলে থাকা যায় না। একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ নারীত্বের ধারণাকে ধ্বংস করা। আর একজন নারীকে পুরুষ হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ পুরুষত্ব অর্থহীন সাব্যস্ত করা। যখন অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলা হবে, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলা হবে সেটা প্রভাবিত করবে পুরো সমাজকে। যখন পাঠ্য বইয়ে আর ক্লাস রুমে ট্রান্সজেণ্ডার শেখানো হবে তখন কিশোর কিশোরীদের ওপর এর প্রভাব পড়বে। যখন এই আচরণকে স্বাভাবিক বলা হবে, তখন সেটার ফলাফল হবে ভয়ানক। মানসিক অসুস্থতা আর আচরণগত বিকৃতিকে যখন মিডিয়ার মাধ্যমে রংচং চড়িয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে তখন বিকৃতির স্বীকৃতির অর্থ সেটা স্বাভাবিকীকরণ এবং প্রসার।

ট্রান্সজেন্ডার এর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো মানুষকে তার কৃতকর্ম দিয়ে বিচার করা। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ মনের ইচ্ছা ও বাসনাকে বাস্তবায়ন না করবে, ততক্ষণ তাকে পুরস্কার প্রদান বা তিরস্কার করা যায় না। সেই হিসেবে আমাদের পরিবারের কারো মধ্যে যদি শৈশব থেকেই নিজের ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে দেখা যায় অথবা কেউ যদি তার

আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ বিভ্রান্তিতে ভুগতে থাকে তাহলে তার প্রতি আমাদের যে কাজগুলো করা উচিত:

- শুরুতেই তাকে সর্বাত্মকভাবে দোষী সাব্যস্ত না করা।
- তার সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।
- তাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে প্রয়োজন বোধে তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গিয়ে মানসিক চিকিৎসা করানো।
- তাকে আক্রমণ না করে, কটু কথা না বলে, এক ঘরে করে না রেখে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।
- প্রয়োজনে ইসলামী শরীয়তের আলোকে যথাযথ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সেই সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা পরমত সহিষ্ণুতার নামে তার এ বিকৃতিকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে না নেওয়া।

কেননা মানসিক অসুস্থতা আর অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব না। অস্বাভাবিক বিষয়কে স্বাভাবিক বলা হলে, অসুস্থতাকে সুস্থ বলা হলে , সমাজের জন্যই তা অকল্যাণকর হবে। আর ট্রান্সজেন্ডারবাদ ঠিক তাই করছে। তাই নিজের শরীর বা আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যায় ভোগা মানুষদের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব হলো তাদেরকে এই অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনা, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করা এবং এই অসুস্থতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

জাতির এই সংকটে আমাদের করণীয়

এই পৃথিবী সৃষ্টির মূলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই আল্লাহ তাআলা সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হলো ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ। যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া প্রত্যেকটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব এবং আদর্শিক লড়াই। বর্তমান সময়ের আলোচিত এই সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য আমরা যে সকল পদক্ষেপ নিতে পারি তা হল :

- **ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা :**

আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করা অত্যন্ত পাপ যা আজ পশ্চিমা বিশ্বের কিছু দেশ ও এনজিও মুসলিম দেশগুলোতে বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর এবং তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দিবানিশি

কাজ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব হল সভ্যতা বিধ্বংসী এই ফিতনার লাগাম টেনে ধরা ও প্রসার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

- **ট্রান্সজেন্ডারবাদকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা :**

সামাজিক উচ্ছৃংখলতা, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অবৈধ যৌনাচার প্রবণতা হ্রাস করতে, পরিবার প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে, সর্বোপরি সামাজিক ভারসাম্যতা রক্ষা করতে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

- **জনসচেতনতা তৈরি করা :**

সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার এর বিরুদ্ধে সভা, সেমিনার ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট বিতরণ ও লিখনির মাধ্যমে এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। পাশাপাশি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পরিবারের সকলকে টিনেজার ছেলে মেয়েদের প্রতি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তারা আক্রান্ত না হয় এমন বিকৃত মানসিক রোগে।

- **ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা:**

সন্তানকে ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটিকিউ মতাদর্শ থেকে রক্ষা করতে হলে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এজন্য দরকার হলে পরিবারের লাইফস্টাইল পাল্টাতে হবে। পিতামাতাকে সন্তানের রোল মডেল হতে হবে। সন্তানরা নেশা করছে কিনা তা নিয়ে পিতা-মাতাকে সতর্ক মনিটরিং করা জরুরি।

- **ট্রান্সজেন্ডারবাদের আইনী বৈধতা না দেওয়া :**

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সমাজের সহনশীল ও স্বাভাবিক করে এমন কোন আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের অধিকার সুরক্ষার নামে কোন আইন পাস করা সরকারের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। কেননা তা রাষ্ট্রীয়ভাবে, সামাজিকভাবে কিংবা ধর্মীয়ভাবে সবার জন্যই হুমকি স্বরূপ।

- **শিক্ষা ব্যবস্থাকে ট্রান্সজেন্ডারবাদের থাবা থেকে রক্ষা করা :**

নতুন নতুন মোড়কে ধেয়ে আসা ফিৎনাকে চিনতে হলে অহির জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করার কোন বিকল্প নেই। যার ভিতরে শারঈ জ্ঞানের অভাব রয়েছে, সে খুব সহজেই চকটদার চিন্তাধারা ও মতবাদের টোপ গিলে ফেলে। মনে রাখতে হবে- বর্তমান সময়ে কাফের-মুসলিমদের সাথে আমাদের যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেটা হচ্ছে 'চিন্তার যুদ্ধ'। আর এই চিন্তার যুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন হচ্ছে 'শিক্ষা ব্যবস্থা'। আমাদের দেশের 'শিক্ষা ব্যবস্থা' অনেক আগেই তাদের হামলার শিকার হয়েছে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সুতরাং নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে ফিৎনামুক্ত ও আল্লাহমুখী করতে হলে অবশ্যই ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী শিক্ষানীতিকে ব্যাপকভাবে চর্চা করতে হবে।

- **নিজস্ব ঐতিহ্যকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা :**

আমাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, পরিবার-সভ্যতা, ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হলে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এই সমস্যাটিকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং রূপান্তরকামী নারী-পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকদের বয়কট করতে হবে।

- **মানসিক চিকিৎসায় সহযোগিতা করা :**

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ একটি মানসিক রোগ। সুতরাং নাটক, সিনেমা, মুভি এবং অসৎ সঙ্গের প্রভাবে কেউ যদি ছেলে হয়েও নিজেকে মেয়ে মনে করে বা মেয়ে হয়ে নিজেকে ছেলে দাবী করে বসে, তবে তাকে দূরে না ঠেলে দেওয়া কর্তব্য। মনোরোগের চিকিৎসায় বহুল চর্চিত এবং প্রচলিত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হলো কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি [Cognitive Behavioral Therapy (CBT)]। এই থেরাপির মাধ্যমে এই মানসিক সমস্যাকে দূর করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের নামে কেবল কিছু বিকৃত রুচি ও মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের উদ্ভট মতবাদ নয়। এটি লিবারেলিজম নামক বৃহত্তর মতবাদের অধীনে একটি উপমতবাদ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদ-উত্তর সময়ে পুরো বিশ্বের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে লিবারেলিজম চাপিয়ে দিচ্ছে। এই অন্যায্য আরোপের ধারাবাহিকতায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এলজিবিটিকিউ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার চাপ। পশ্চিমা বিশ্বে লিবারেলিজম মূল্যবোধের অবক্ষয়, যৌন বিশৃঙ্খলা ও পরিবারব্যবস্থার ধ্বংস ডেকে এনেছে, তা পশ্চিমা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের উপরও চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। এর পেছনে সরাসরি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন পশ্চিমা সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও ও মিডিয়া হাউজ। আমাদের সভ্যতা ও মূল্যবোধ রক্ষা করতে এলজিবিটিকিউ এবং এর নামে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে এ দেশে স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে।

আমরা যেকারণে ধর্ষণের বিরোধিতা করি, ঠিক একই কারণে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ও সুরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে কথা বলব। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসিনি এবং আমাদের দেহ আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। সুতরাং আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসাবে বানিয়েছেন তাকে চিরকাল পুরুষ হিসাবে থাকতে হবে এবং আল্লাহ যাকে নারী বানিয়েছেন তাকে চিরকাল নারীই থেকে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'সৃষ্টি যার হুকুম ও

বিধান চলবে তার' (আ'রাফ ৭/৫৪)। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং যাবতীয় ফিৎনা থেকে নিরাপদ করুন। বিশ্বের গোটা মুসলিম উম্মাহ্কে এর ভয়াল থাবা থেকে হেফাযত করুন। আর আমাদের দেশের দায়িত্বশীল মহলকে বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের মতো একটি কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখুন। আমীন!

রেফারেন্স:

১. সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন, ড. মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন।

২. অবক্ষয়কাল, আসিফ আদনান।

৩. ট্রান্সজেন্ডারিজম মতবাদ এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপট, ড. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন।

৪. মাসিক আল কাউসার।

৫. মাসিক আত-তাহরীক।

৬. ডেইলি নয়াদিগন্ত।

৭.ইসলামি আইন ও বিচার।